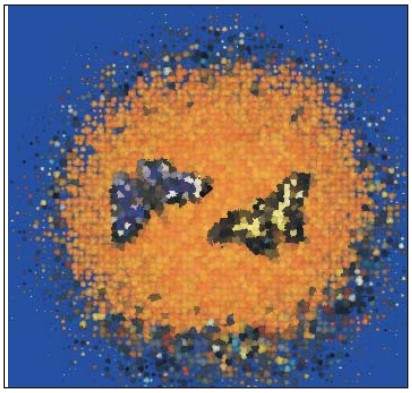

# বিসিএস ভালোবাসা

**মোকাদ্দেস আলী রাব্বী**

টোকন যতটা আবেগ আর উচ্ছ্বাস নিয়ে দৌড়ে এসেছিল মোবাইলের দোকানে, তা রূপান্তর নিয়েছে এখন টেনশনে। মোবাইল হাতে নেবে কি না সে বুঝতে পারছে না। ফোন করবে কি করবে না, তাও ভেবে উঠতে পারছে না। শীতের দিনে কেউ ঘামে? সে দরদরিয়ে ঘামছে। ওকে খুব নার্ভাস লাগছে। মোবাইল দোকানের ভেতরে বসে আছে দু'জন সুন্দরী তরুণী ও দু'জন বালক। তারা ফ্যালফ্যাল করে ওকে দেখছে। নার্ভাস হয়ে পড়া মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকতে মাঝে মাঝে খুব ভালো লাগে। তরুণীদ্বয় ও বালকদ্বয় হয়তো তা উপভোগ করছে।

টোকন এক সময় মোবাইল ফোন হাতে নিল। ফোন হাতে নিয়ে সে চিন্তা করতে শুরু করলো কোনো কোড টিপবে।

ঘটনা হলো এই, টোকনের আজ বিসিএস লিখিত পরীক্ষার ফল বের হয়েছে। সে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। ভার্সিটি জীবনে কোনো বান্ধবী বা প্রেমিকা ওর ভাগ্যে জোটেনি। তাই মনে মনে সিদ্ধান্ত ছিল যে, বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় টিকলে সে তার নাম্বার দিয়ে খুঁজে নেবে একজনকে। রোল নাম্বারের সঙ্গে কোনো কোড নাম্বার সামনে জুড়ে দিলেই হয়। এটা সিদ্ধান্ত নয়, বলা চলে এক ধরনের পাগলামি। সেই পাগলামি করতে মূলত মোবাইলের দোকানে ছুটে আসা।

টোকন ইচ্ছে মতো একটি কোড টিপল। এরপর তার সঙ্গে যুক্ত করলো, বিসিএস রোল- ১০৮৮৮৬। সেন্ড বাটন চাপার পর অপেক্ষা করতে লাগলো অপর পাশের কণ্ঠ শোনার জন্য। ৫ সেকেন্ডের বেশি অপেক্ষা করতে হলো না তাকে। অপর পাশের কণ্ঠ শোনা গেল। বলছে, 'দুঃখিত এই মুহূর্তে মোবাইল সংযোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। অনুগ্রহ করে একটু পরে আবার ডায়াল করুন। সরি দ্যা মোবাইল...।'

টোকন হাঁফ ছাড়ল। নতুন আরেকটি কোড টিপে আবার চেষ্টা করতে শুরু করলো। এবার অপর পাশের কণ্ঠ শুনতে পুরো ২৮ সেকেন্ড অপেক্ষা করতে হলো। অপর পাশ থেকে দুই দু'বার হ্যালো শব্দ শোনা গেল। ও পাশের কণ্ঠ তরুণীর, নিজেকে যেন বিশ্বাস করাতে পারছিল না টোকন। এদিকের কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে তরুণী কিছুটা ক্ষিপ্ত মেজাজে বলে উঠলেন, হ্যালো কে? কথা বলেন। তড়িঘড়ি করে টোকন বলে উঠল, হ্যালো।

- কে? অপর পাশে ঝাঝালো কণ্ঠস্বর।

- বিসিএস। ঝটপট বলল টোকন।

- বিসিএস! আপনি কি ফাজলামো করছেন? তরুণীর রাগ কমল না একটুও। টোকন বলল, দয়া করে মনে কিছু নেবেন না। আসলে আমি ফাজলামো করছি না। আমার কথা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবেন।

অপর পাশে তরুণীর কণ্ঠ এতো নরম হয়ে গেল যা বলে বোঝানো মুশকিল। খুব সুরেলাভাবে বলল, আচ্ছা বলুন।

এরপর টোকন ঘটনা খুলে বলতে শুরু করলো। ঘটনা শুনে রুবিনার হাসতে হাসতে যেন পেট ফেটে যাওয়ার মতো অবস্থা। তরুণীর নাম রুবিনা। এরপর একটানা টোকনের সঙ্গে কথা চলতে থাকলো। মোবাইল ছেড়ে দিয়ে টোকন তো আহম্মক। পুরো ১৫ মিনিট কথা বলেছে সে। হিসাব অনুযায়ী মোবাইল বিল হয়েছে ৬০ টাকা। ওর কাছে আছে ৫২ টাকা। দোকানদার ১৫ মিনিট দেখে মুখ কিছুটা ঝলমল করছে। দেখে মনে হচ্ছে, এর আগে কোনো গ্রাহক এসে ১৫ মিনিট কথা বলেনি।

দোকানদার বলল, ভাই সাহেব আপনার কথা শুনে ভীষণ মজা পেলাম। হাঃ হাঃ। বিল তো হয় ৬০ টাকা, আপনি ৫০ টাকা দেন।

টোকন যেন এ কথা শুনে স্বস্তি পেল।

এভাবেই প্রথম কথা ও পরিচয় হয় রুবিনার সঙ্গে। এরপর থেকে আর ব্যবসায়িক মোবাইলে নয়, নিজের মোবাইল দিয়ে ঘন ঘন কথা হয় রুবিনার সঙ্গে। কথা শুরু হলে মিনিটের পর মিনিট চলতেই থাকে। রুবিনাও মাঝে মাঝে ফোন করে টোকনকে। সম্পর্কটা ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব থেকে যে অন্যদিকে এগোয় তা ভেবে টোকনের ভীষণ খুশি লাগে। সারাক্ষণ শুধু একটা চিন্তা, রুবিনা দেখতে কেমন হতে পারে?

আজ সকাল থেকেই রুবিনা বারবার মিসকল দিচ্ছে। টোকন বাবা-মার সামনে আছে বলে কল ব্যাক করতে পারছে না। বাবা-মার সামনে সে কি বলবে রুবিনাকে? আর এ মুহূর্তে বাবা-মার আড়াল হওয়াও সম্ভব হচ্ছে না। রুবিনা একবার কলও দিয়েছিল। ইচ্ছে করেই রিসিভ করেনি টোকন।

এক সময় আড়াল হয়ে ছাদে চলে যায় টোকন। রুবিনার সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন। নিশ্চয় কোনো দরকার আছে। ছাদে উঠতেই মুডটা অফ হয়ে যায় টোকনের। ছাদে গিয়ে ও দেখল পাশের বাসার ছাদে দাঁড়িয়ে আছে সেই ঝগড়াটে মেয়েটা।

সেই ঝগড়াটে মেয়েটা বলতে পাশের বাসার ফারাহ্। ফারাহ্ দেখতে খুব সুন্দর। টোকন তো প্রথম দেখাতেই ওকে ভালোবেসে ফেলেছিল গোপনে গোপনে। মেয়েটাও কেমন ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকতো ওর দিকে। টোকন ভেবে নিয়েছিল ফারাহ্ও ওকে ভালোবাসে। কিন্তু ফারাহ্ যে কতোটা ঝগড়াটে স্বভাবের তা হারে হারে টের পেয়েছে টোকন। ভাগ্যিস নিজের মনের কথাটা বলা হয়নি ফারাহ্কে।

একদিন টোকন তাড়াহুড়ো করে বের হয়েছে এক জায়গায় যাবে বলে। গেটে বেরিয়ে একটা রিকশা পায়। ভাড়া ঠিক করতে থাকে সে। হঠাৎ পাশের বাসার গেট দিয়ে ফারাহ্ বের হয়ে এসে সেই রিকশায় উঠে বসে। রিকশাওয়ালাকে বলে, চলেন সামনে। টোকন আরে কি করছেন কি করছেন বলতে বলতে রিকশা নিয়ে উধাও হয়ে গেল ফারাহ্। সেদিন কিছু বলা হয়নি আর। এরপর আরো একদিন একই ঘটনা। সেদিন পেছনে থেকে ডাকলো টোকন। ফারাহ্ নেমে এসে শুরু করে দিল তর্কাতর্কি। শুধু এই শেষ নয়। টোকনকে দেখলে মেয়েটা যেন কেমন কেমন করে। ভেংচিও কাটে।

এতো কিছুর পর টোকন সিদ্ধান্ত নিয়েছে এ ধরনের ঝগড়াটে মেয়েকে ভালোবাসা যায় না।

টোকন ছাদে ফারাহ্কে দেখে উল্টোদিকে মুখ করে মোবাইল বের করলো। নির্ধারিত কোডসহ নিজের বিসিএস রোল টিপে কল দিল রুবিনাকে। এরপর রুবিনার সঙ্গে কথা বলতে থাকলো। হাসতে হাসতে এক সময় মুখ ঘোরাতেই পাশের বাসার ছাদে আবারও চোখ যায় টোকনের। দেখে ফারাহ্ নামের ঝগড়াটে মেয়েটা তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে

মিছে মিছে মোবাইলে কথা বলার অভিনয় করছে। দেখে গা যেন জলে উঠলো ওর। রুবিনার সঙ্গে ইচ্ছে করে কথা শেষ করলো টোকন। টোকনের দেখাদেখি যেন ফারাহ্‌র অভিনয়ও শেষ হলো। টোকনের মোবাইল বন্ধ করতে দেখে ফারাহ্‌ও মোবাইল অফ করলো। এরপর বিশাল একখানা ভেংচি কেটে অহঙ্কারীর মতো নেমে গেল ছাদ থেকে।

টোকন মনে মনে বলল, ঝগড়ি তোর গাল টেনে আমি লম্বা করবো। কিছুক্ষণ ঝগড়াটে মেয়ে ফারাহ্‌কে নিয়ে ভাবে সে। পরক্ষণে তার মন আনন্দে নেচে উঠে। রুবিনার কথা মনে পড়ে। কিছুক্ষণ আগে রুবিনা জানিয়েছে, আগামীকাল তাদের দেখা হচ্ছে। প্রথম দর্শন তাদের ভ্যালেন্টাইন ডেতেই হোক। আগামীকাল ভ্যালেন্টাইন ডে। কোথায় দেখা হবে, কীভাবে দেখা হবে তা জানিয়েছে রুবিনা। আর হাতে তো মোবাইল থাকছেই।

পরের দিন নির্ধারিত জায়গায় পার্কে এসে টোকন অপেক্ষায় থাকে রুবিনার জন্য। চারদিকে নানান জুটি দেখে বারবার রুবিনার কথা মনে পড়ে ওর। রুবিনাকে নিয়ে কল্পনার জগতে ভাসতে থাকে প্রতিটি ক্ষণ। যতবারই কল্পনার জগতে রুবিনার চেহারা খোঁজে টোকন, ততবারই ফারাহ্‌ মেয়েটা ভেসে উঠে আসে রুবিনা হয়ে। রুবিনার চেহারা, কল্পনা করে টোকন ভাবে, তবে কি রুবিনা ফারাহ্‌র মতো সুন্দর! তাই যদি হয় তবে রুবিনা যেন ঝগড়াটে স্বভাবের না হয়।

টোকন চোখ বন্ধ করে আবার রুবিনাকে নিয়ে কল্পনার জগতে চলে যায়। কল্পনার জগতে টোকন রুবিনাকে নিয়ে একটি গানের অভিনয় করে নায়ক-নায়িকাদের মতো। গান শেষ হতেই বুঝতে পারে যার সঙ্গে টোকন গানের অভিনয় করলো সে রুবিনা নয়, ফারাহ্‌। ঝটপট চোখ খোলে টোকন। মনে মনে ভাবে, আর সে কল্পনা করবে না রুবিনাকে।

চোখ খুলেই বিরক্তিবোধ করে টোকন। কেননা, তার সামনে হেঁটে এদিকে আসছে ফারাহ্‌ নামের সেই ঝগড়াটা মেয়েটা। টোকন ইচ্ছে করে অন্যদিকে তাকায়। এদিকে ফারাহ্‌ও টোকনকে দেখে বিরক্তিবোধ করে। মুখে ভেংচি কেটে অন্যদিকে গিয়ে বসে।

টোকন অপেক্ষা করতে থাকে। হঠাৎ রুবিনার ফোন বেজে ওঠে মোবাইলে। রিসিভ করে টোকন। এরপর কথা বলতে থাকে।

রুবিনা বলে, তুমি কোথায়?

টোকন বলে, আমি তো নির্ধারিত জায়গায় এসে বসে আছি।

রুবিনা বলে, আমিও তো বসে আছি নির্ধারিত জায়গায়।

- কি আশ্চর্য! আমাদের তা হলে দেখা হচ্ছে না কেন?

টোকন কথা না বলে এবার ফারাহ্‌র দিকে তাকায়। কি আশ্চর্য! মোবাইলে রুবিনা যা বলছে ফারাহ্‌ কেন জানি একই কথা বলছে। বিস্মিত হয়ে ফারাহ্‌ও ওর দিকে তাকায়।

দুজনে এগুতে থাকে কাছাকাছি হওয়ার জন্যে।

টোকন বলে, আপনি?

ফারাহ্‌ বলে, আপনি?

টোকন বলে, আপনি না ফারাহ্‌?

ফারাহ্‌ বলে, ফারাহ্‌ বিনতে রুবিনা আমার পুরো নাম।

টোকনের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। ঝগড়াটে মেয়েটা রুবিনা? এরপর আর কি, আবার তর্ক-বিতর্ক শুরু হয় ওদের মধ্যে। মানে ঝগড়া। এরপর এক সময় হাত ধরাধরি করে চলতে শুরু করে হাসতে হাসতে। হয়তো নতুন পথের খোঁজে।

**সারাই মিয়াপাড়া**
**হারাগাছ, রংপুর-৫৪৪১**

---

# মনঘুড়ি...

**জাহিদ আকবর**

আরিয়ান আর কখনো গান গাইবে না। সুরের মাদকতায় ভেজাবে না চারদিক.. সুরে সুরে আর ছবি আঁকবে না। আকাশ দেখে বলবে না, 'আমি আকাশ হবো রে অর্ণব।' আকাশ হতে পারেনি আরিয়ান, কিন্তু তার ভেতরটা ছিল আকাশ সমান। সেখানে ছিল না কোনো কালো মেঘের আনাগোনা... এই তো সপ্তাহখানেক আগের ঘটনা। হঠাৎ মুঠোফোনটা বেজে উঠল। স্ক্রিনে তাকিয়ে দেখে আরিয়ান। দেয়াল ঘড়িতে তখন রাত ১০টা।

- কোথায় এখন তুই?

- আমি তো বাসায়, একটা নোট তৈরি করছি।

- তুই এক্ষুণি চলে আয়, কোনো প্রশ্ন করবি না, তোর জন্য বেইলি রোডের মহিলা সমিতির সামনে অপেক্ষা করছি। বিশ মিনিটের মধ্যে চলে আয়। যদিও বিশ মিনিটের মধ্যে যেতে পারেনি সে দিন, আধঘন্টা সময় লেগেছিল বেইলি রোডে যেতে। আমাকে দেখে মিষ্টি হেসে বলেছিল, 'চল দোস্ত, সংসদ ভবনে গিয়ে সবুজ বিছানায় বসে আকাশ দেখব আর হৃদয় উজাড় করে গান গাইবো...।' যদিও একটু রাগ হচ্ছিল, কিন্তু সেটা বুঝতে না দিয়ে রাজি হয়ে গিয়েছিলাম সংসদ ভবনে যেতে। অতঃপর একটা ক্যাব নিয়ে সোজা সংসদ ভবন। সেখানে গিয়ে গিটারটা বের করে আগের রাতে লেখা একটা গানে সুর তোলার চেষ্টা করছিল আরিয়ান।

'আমার কাছ থেকে দূরে চলে গেছ
ভাবছ আমার কিছু নেই
আমার আছে বিশাল আকাশ
ভালোবাসা রাখি সেখানেই।'

সুন্দর কথার একটা গান। খুব বেশি গান লিখতো না। যা লিখতো সব নিজের জন্য। ওর লেখা প্রতিটি গানের কথায় কেন জানি 'আকাশ' শব্দটা এসে যেতো। সে দিন গান গাইতে গাইতে সংসদ ভবনের সবুজ ঘাসের বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশ দেখছিল আরিয়ান। আকাশ দেখতে দেখতে বলেছিল, 'বুঝলি অর্ণব, আকাশটা হলো কবিতার খাতা, তারাগুলো কবিতার উপমা। এতো সুন্দর কবিতা আর কোথাও পাবি না। আয় একসঙ্গে দু'জনে আকাশের কবিতা পড়ি।'

## দুই

বৃষ্টি অসম্ভব রকম প্রিয় ছিল আরিয়ানের। ওর একটা গান আছে 'জলরঙে আঁকা বৃষ্টি'। গানটা শুধু বৃষ্টির দিনগুলোতে গাইতো। বৃষ্টি না হলে কেউ ওকে গানটা গাওয়াতে পারেনি, এমনকি মেঘবতীও না। এই নিয়ে মাঝে মাঝে ওদের মধ্যে তুমুল মান-অভিমান হতো।

গত মাসে আরিয়ানের ২৩তম জন্মদিনে ওর সব বন্ধুরা টিএসসিতে ওকে সেলিব্রেট করেছিল। একে একে গান গেয়ে যাচ্ছে আরিয়ান। এক সময় মেঘবতী 'জলরঙে আঁকা বৃষ্টি' গানটা গাইতে বলেছিল, কিছুতেই রাজি হয়নি। এই নিয়ে অনেকক্ষণ অভিমান করে ছিল মেঘবতী। যতক্ষণ অভিমান করে ছিল, ততক্ষণ জন্মদিনের কেক কাটেনি আরিয়ান। কখনো যদি কোনো বিষয়ে না বলেছে, হ্যাঁ করানো যায়নি। 'জলরঙে আঁকা বৃষ্টি' গানটা বৃষ্টিঝরা এক রাতে লিখেছিল-

'বৃষ্টিকে এনে সাদা কাগজে

রঙ-তুলি দিয়ে যদি আঁকা হতো।
তবে বৃষ্টিকে এনে জলরঙে
আঁকতাম আমি ইচ্ছামতো।'

## তিন

নীল রঙের প্রতি ভীষণ রকম টান ছিল আরিয়ানের। নীল রঙ নাকি ওকে গতি দিত। বেশির ভাগ সময় নীল টি-শার্ট আর জিন্স পরত। ভালোবাসা দিবসের একটা কনসার্টে গান গাইবার কথা ছিল আরিয়ানের। মেঘবতীকে সেখানে নীল শাড়ি পরে আসতে বলেছিল। কোনো কারণে নীল রঙের শাড়ি পরে আসেনি সে দিন। রাগে সেই কনসার্টে গানই গায়নি আরিয়ান। বুঝিয়েও কোনো লাভ হয়নি।

শৈশবের একটা কষ্টের স্মৃতি নীল রঙের প্রতি উৎসাহিত করেছে আরিয়ানকে। তাদের ছিল অভাবের সংসার। তিনবেলা ঠিকমতো খাবার জুটতো না। ১২ বছর বয়স তখন। নীল রঙের একটা জামা অনেক বড় করে বানিয়ে দিয়েছিল ওর বাবা। ওই জামাটা ৪ বছর পরতে হয়েছিল আরিয়ানকে। কোনো এক জোছনা মাতাল রাতে এই নিয়ে চোখ ভিজিয়েছিল। খুবরো পয়সার মতো চকচক করছিল ওর দুচোখ। আবেগী কণ্ঠে বলেছিল, 'অর্ণব ইচ্ছা করলেই এখন যেকোনো দামি শপিং সেন্টার থেকে নিত্যনতুন দামি জামা কিনতে পারি। কিন্তু শৈশবের সেই নীল জামাটা আমাকে কেউ ফিরিয়ে দিতে পারবে না। জানিস অর্ণব, সেই নীল জামাটার গন্ধ আমি এখনো পাই।'

## চার

মেঘবতীকে অসম্ভব রকম ভালোবাসতো আরিয়ান। যাকে বলে মনপ্রাণ উজাড় করা ভালোবাসায় সারাক্ষণ দুজন-দুজনকে জড়িয়ে রাখতো। মেঘবতী ছিল আরিয়ানের গানের ভীষণ রকম ফ্যান। বসন্ত উৎসবের একটা গানের অনুষ্ঠানে প্রথম পরিচয় হয়েছিল গত বছর। এরপর টুকটাক মুঠোফোনে কথোপকথন। ধীরে ধীরে দুজন-দুজনার হৃদয়ের খুব কাছাকাছি চলে এসেছিল। সমস্যা তৈরি হয়েছিল মেঘবতীকে কেন্দ্র করে। ওদের পাড়ার একজন বখে যাওয়া ছেলে পছন্দ করতো মেঘবতীকে। সব সময় চোখে চোখে রাখতো কখন কোথায় যাচ্ছে...

একদিন রমনা রেস্তোরাঁয় ওরা দুজন বসে কথা বলছিল। এমন সময় সেই বখে খাওয়া ছেলেটাসহ কয়েকজন এসে আরিয়ানকে মেঘবতীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বলেছিল। আরিয়ান উচ্চারণ করেছিল, 'আত্মাকে কখনো দেহ থেকে আলাদা করা যায় না। দেহটাকে আত্মা থেকে আলাদা করতে চাইলে দেহটাকে শেষ করে দিতে হবে।' সে দিন বেশি কিছু না বলে 'দেখে নেব' বলে চলে গিয়েছিল ওরা। ওদের সম্পর্কে ভালোভাবে জানে বলে ভীষণ রকম ভয় পেয়েছিল মেঘবতী। 'তুমি ওদের চেন না আরিয়ান, ওরা কত ভয়ঙ্কর। এমন কিছু নেই ওরা করতে পারে না।'

'মেঘবতী একটা কথা মনে রেখো, হুমকি দিয়ে আমাকে কখনো তোমার কাছ থেকে আলাদা করতে পারবে না। যদি আমাকে আলাদা করতে হয়, একেবারে শেষ করে দিতে হবে। শেষ করে দিলেও তো আমাদের ভালোবাসা মরে যাচ্ছে না মেঘবতী!' সে দিন অনেকক্ষণ কান্না থামাতে পারেনি মেঘবতী।

## পাঁচ

আরিয়ানের প্রথম গানের অ্যালবামের সফলতার পর দুই বছর বিরতি দিয়ে দ্বিতীয় গানের অ্যালবাম রেকর্ডিংয়ের কাজ শেষ হয়েছিল গত রাতে। শেষ গানটা ছিল-

'উড়িয়ে দিলাম মনঘুড়ি হৃদয় আকাশে
অনুভবের সবুজ সুতোয় দখিনা বাতাসে।
চোখে-চোখে রাখছি ঘুড়ি যায় না যেন কেটে
উড়িয়েছি মনঘুড়িটা অপার বিশ্বাসে।

এবারের অ্যালবামের নাম 'মনঘুড়ি' রাখবে ঠিক করেছিল। রেকর্ডিং শেষ হতে হতে রাত ২টা বেজে গিয়েছিল। বেইলি রোডের স্টুডিও থেকে হাঁটতে হাঁটতে বাসায় ফিরছিলাম। আকাশটা ছিল অসম্ভব রকম নীলে ভরপুর...। রাতের শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফিরছি। হঠাৎ করে ওঁত পেতে থাকা ৫-৬ জনের একটা দল আমাদের দুজনকে ঘিরে ধরলো। ওদের একজন কি দিয়ে যেন জোরে আমার মাথায় আঘাত করল। আমি ওদের শেষ কথাটা শুধু শুনেছিলাম। 'মেঘবতীকে পাওয়ার স্বাদ বুঝিয়ে দেব শুয়োরের বাচ্চা।' তারপর নিজেকে আবিষ্কার করি হাসপাতালে। কে একজন এসে বললো, 'আরিয়ান ভোরাতের দিকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে।' কী করবো, কী বলবো কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। বুকের ভেতর অসম্ভব রকম অস্থিরতা। ছুটে গেলাম আরিআয়ানের কাছে। আরিয়ানের মুখটা নীল হয়ে গেছে। পরনে নীল টি-শার্ট। আরিয়ান যেন নীল আকাশ!

**অতঃপর...**

আরিয়ানের মৃত্যু সংবাদ শোনার পর মেঘবতী কারো সঙ্গে কোনো কথা বলেনি। একেবারে নিশ্চুপ পাথর হয়ে গেছে। আজও কারো সঙ্গে কথা বলে না।

**উনিশ কুড়ি**
**৪৫, সিদ্ধেশ্বরী লেন, ঢাকা-১২১৭**

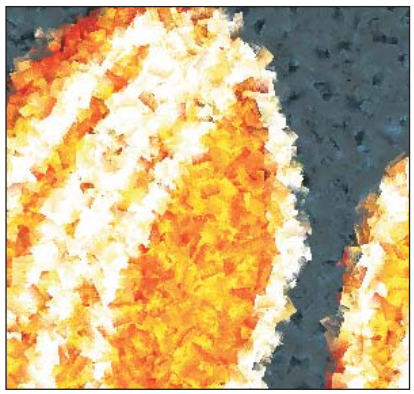

# একজন জরিনা...

**রাশেদুল ইসলাম সুমন**

বাচা মিয়ার ষোড়শী কন্যা জরিনা। গায়ে গতরে বেশ, শরীরের রঙখানা দুধে আলতা।

সখিরা কয় জরিনা তোর চেহারা সিনেমার হিরোইনের লাহান, একদম শাবনূরের লাহান। জরিনা মিট মিট করে হাসে আর কয়, কি যে কস তোরা আমি হইলাম তোগোর জরিনা। আমি শাবনূর হইতে যামু কেন? জরিনার রাতে ঘুম আসে না। সিনেমার নায়িকা হওয়ার স্বপ্ন দেখে। কল্পনার জগতে জরিনা রিয়াজ, ফেরদৌস, শাকিল খান, নায়ক রুবেলের পাশে দেখে নিজেকে।

এ কথা সে কথার ছলে জরিনা সখিদের কয় আচ্ছা সখি কও তো দেখি নায়িকা হইতে হইলে কি কি করণ লাগে?

'হাফপ্যান্ট পরন লাগে, ব্লাউজের উপরের দুইডা বোতাম খুল্যা রাখন লাগে, পরিচালকের লগে ফষ্টিনষ্টি করণ লাগে, আরো কতো কি...' জরিনার বিশ্বাস হয় না, কয় তোরা আমার লগে মিথ্যা কয়তেছস। তোরা আমার ভালো চাস না।

গ্রামের মেম্বার কুদ্দুস মিয়ার ছেলে মজনু মিয়া জরিনাকে স্বপ্ন দেখায়। নায়িকা হবার স্বপ্ন। জরিনা মজনু মিয়ার উপর বিশ্বাস রাখে। মজনু মিয়া ভালোবাসে জরিনার শরীরটাকে, সুযোগ পেলেই বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে জরিনার শরীরটাকে কাছে টানে। জরিনা বাধা দেয়। কয় এখন না বিয়ের পর ওসব। বাধ মানে না মজনু। বলে ফেলে আর। সহ্য হয় না কালই আমরা শহরে গিয়ে বিয়ে করব। তারপর তোমাকে সিনেমার পরিচালকের কাছে নিয়ে যাব, তুমি হবে ঢাকার নামকরা নায়িকা।

জরিনা তার বাবা বাচা মিয়ার কথা ভেবে না করতে চায়। মজনু মিয়া বলে অতসব চিন্তা করলে নায়িকা হওয়া যায় না। কালকে ঠিক সাতটার সময় আমরা রওনা হব। তুমি রেডি হয়ে থাকবে আমি তোমাকে নিতে আসব।

ঢাকায় এসে মজনু জরিনাকে তোলে তার

এক আত্মীয়ের বাসায়। জরিনাকে নিজের বউ বলে পরিচয় দেয় মজনু। জরিনা প্রথমে আপত্তি তুললে মজনু বলে কাল সকালে তো কাজী অফিসে গিয়ে বিয়ে করছি, একসঙ্গে থাকতে অসুবিধা কি। গ্রামের সহজ-সরল মেয়ে জরিনা। লজ্জার খাতিরে জরিনা ফ্লোরে বিছানা পেতে শুয়ে পড়ে। মজনু বলল তুমি চকির ওপর শোও। সুচতুর মজনু জানে এখনই বেশি বাড়াবাড়ি করলে হিতে বিপরীত হতে পারে, তাই বলল তোমার যা মর্জি।

নতুন জায়গা জরিনার ঘুম আসছে না, চোখ বুঝে পড়ে আছে। জরিনা ও জরিনা ঘুমিয়ে পড়ছ বলতে বলতে মজনু খোস মেজাজ নিয়ে জরিনার পাশে শুয়ে পড়ে। জরিনা বলছে ঘুম আসছে না। ওপাশ ফিরে আছ কেন এসো গল্প করি বলেই মজনু জরিনাকে জড়িয়ে ধরে। ষোড়শী দেহখানা বিদ্যুৎগতিতে কেঁপে ওঠে, শরীরের সমস্ত রক্ত কণিকায় আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। প্রথম মিলনের স্বাদ। জরিনা নিজেকে মজনুর বাহু বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেনি।

সকালে জরিনা কাজী অফিসে যাওয়ার কথা বলতেই মজনু বলে তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি মালিবাগ এক বন্ধুর কাছে কিছু টাকা পাব, টাকাগুলো এনে দু'জনে কাজী অফিসে গিয়ে বিয়েটা সেরে ফেলব। আর শোন, তোমার আমার বিয়ে হয়নি এ কথা বাড়ির কাউকে বলার দরকার নেই। দুপুর গড়িয়ে বিকাল হয়ে আসছে মজনুর খবর নেই, জরিনার মনের মধ্যে নানা প্রশ্ন দোলা দেয়। কাল রাতের কথা ভেবে জরিনার নিজেকে অপরাধী মনে হয়। রাত ১০টায় বাসায় ফেরে মজনু। কথাবার্তা না বলে জরিনা নিচে বিছানায় পেতে শুয়ে পড়ে আজও। মজনু বুঝতে পারে জরিনা রাগ করেছে। শুনবে তো কেন আসতে পারলাম না। বিশ্বাস কর আমার কোনো দোষ নেই। হারামজাদাটাকে খোঁজার জন্য সারা ঢাকা শহর চষে বেড়িয়েছি তারপরও পাইনি। কাল সকালেই আমরা কাজী অফিসে যাব। বিয়ে করব। লক্ষীটি রাগ কর না, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি এখনো আমার ওপর রাগ করে আছ? বলছি আমাকে ছোবে না। চৌকির ওপর যাও বলল জরিনা। কালকে সকালেই তো তুমি আমার হয়ে যাচ্ছ এখন আবার লজ্জা কিসের! ওম! জরিনা মজনুকে বলে তাহলে কসম দাও আর কখনো আমার সঙ্গে এমন করবে না।

মজনু বলল, আর এমনটি হবে না। এই তোমাকে ছুঁয়ে বলছি। আজও রাতভর জরিনার শরীরকে নিয়ে মজনু এক্সপেরিমেন্ট চালায়। সকালে জরিনাকে কাজী অফিসে নিয়ে বিয়ে করবে বলে বেরিয়ে পড়ে। জরিনার মনে আজ বেশ ফূর্তি। আজ জরিনা বিয়ের পিঁড়িতে বসবে। তারপর একদিন মজনুর সন্তানের মা হবে। আনুষ্ঠানিকতা নাই বা হলো তবুও তো বিয়ে। বিয়ে তো মেয়ে মানুষের একবারই হয় ইত্যাদি কত কি ভাবে জরিনা। রিকশা চলছে তো চলছেই, মাঝে মাঝে জরিনা মজনুকে জিজ্ঞেস করে, আর কতদূর কাজী অফিস।

ঐ তো সামনের গলির ভেতর, বলে মজনু।

তরে বিয়া করব কেডা?

আমি তোরে আনছি বেচ্ছা দেওনের লাইগ্যা। তুই অহন বড় বড় সাহাবগের লগে ফূর্তি করবি, তরে বেচ্ছা আমি মেলা টাহা পায়ছি- এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে চলছে মজনু। মজনুর মুখের কথা শেষ না হতেই জরিনার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। চারদিক অন্ধকার দেখতে থাকে। মজনুকে উদ্দেশ্য করে বলে, তুমি না আমারে ভালোবাস। আমার অতবড় সর্বনাশ তুমি করো না। তোমার পায়ে পড়ি। আমারে তুমি বিয়া কর। মজনু খেকিয়ে ওঠে, আরে যা যা তোর মতো কত মাইয়া আমাকে ভালোবাসে। তুই ছিলি আমার লাকি সেভেন নাম্বার প্রজেক্ট। তোর আগে আমি আরো ছয়জনকে এইহানে আনছি। মেলা টাহা পায়ছি। মজনু জরিনার কথোপকথন তাদের রিকশার পেছনে মোটরসাইকেলে আসা কর্তব্যরত পুলিশ সার্জেন্ট নূর হোসেন শুনে ফেলে। মুভ, এক পা নড়বে না। পেছনে ফিরে তাকাতেই মজনু পুলিশ সার্জেন্ট নূর হোসেনকে দেখে জরিনাকে রেখে দেয়াল টপকে পালিয়ে যায়। নূর হোসেন জরিনাকে জিজ্ঞেস করে, এই মেয়ে তুমি কে? কোথায় থাক? লোকটার সঙ্গে তোমার পরিচয় হলো কীভাবে। জরিনা হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলে, আমারে বাঁচান স্যার। আমি আপনারে সব কমু।

**প্রযত্নে : মোঃ আতিয়ার রহমান**
**(নগদ বিভাগ), বাংলাদেশ ব্যাংক**
**চট্টগ্রাম-৪০০০**

---

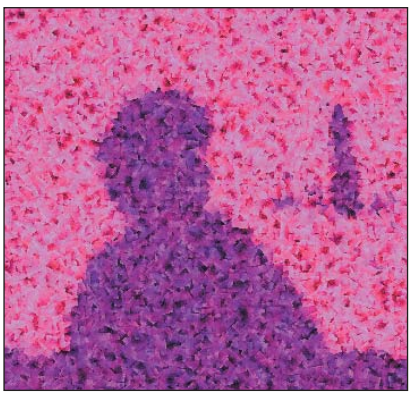

# সুদূরিকা

**শিশির আহ্‌মেদ**

এখন রাত ঠিক ১.৫৫ মিনিট। বাংলাদেশের সঙ্গে মালয়েশিয়ার সময়ের পার্থক্য ঠিক দুই ঘন্টা। সে হিসেবে বাংলাদেশে এখন রাত ১১.৫৫ মিনিট। আর মাত্র ৫ মিনিট পর ঘড়ির কাঁটা ঘোষণা করবে বাংলাদেশে আজ ১৪ ফেব্রুয়ারি... ভ্যালেন্টাইন্স ডে।

ধূমায়িত কফির কাপ হাতে আমি যখন বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম তখন ঘড়ির কাঁটা দ্রুত থেকে দ্রুততর। চরম উত্তেজনায় ঘড়ি দেখলাম... আর এক মিনিট। উদভ্রান্তের মতো রুমে ফিরে গিয়ে ব্যাগ খুললাম। সোনালি ফ্রেমে বাঁধা সুদূরিকার ছবিটা নিয়ে টেবিলের ওপর রেখে কিছু তাজা লাল গোলাপের পাপড়ি। পরম প্রেমে ছড়িয়ে দিলাম ছবির সুদূরিকার মাথার ওপর। না হয় সুদূরিকা জানলো না, তবুও তো ফুল ছড়ালাম। দু'হাতে ছবির নীরব সুদূরিকাকে আঁকড়ে ধরে আমি উচ্চারণ করলাম, হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন্স ডে টু ইউ।

টেবিলের ওপর রাখা টেপ রেকর্ডার অন করতেই শুরু হলো... 'কতদিন পরে এলে একটু বসো... তোমায় অনেক কথা বলার ছিল যদি শোনো...।

**২.**

মোবাইলটা হাতে করে নিঃশব্দে নির্জন বারান্দায় বসে আছি। মানিব্যাগের নোটবুকে লিখে রাখা একটা বিশেষ নাম্বার বের করলাম। সুদূরিকার নাম্বার। মাস ছয়েক আগে বাংলাদেশ থেকে এক বন্ধু পাঠিয়েছিল। এর মধ্যে বহুবার ইচ্ছে হয়েছে ওকে ফোন করি। কিন্তু এখন আর আমার নিজের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। ভালোবাসা ও যুদ্ধে ভুল বলে কিছু নেই... অতএব...

সুদূরিকার মোবাইলের নাম্বারগুলো একে একে টিপে মোবাইলটা কানে ধরলাম। রিং হচ্ছে কিন্তু কেউ রিসিভ করছে না। ও কি তাহলে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম কি ওর বুক থেকে ১২ বছর আগের স্মৃতিগুলো মুছে দিয়েছে। সময়ের বিবর্তনে স্মৃতি কি শেষ হয়ে যায়? কি জানি। ক্রমাগত রিং বেজে চলেছে। আমার ভয় হচ্ছে... আল্লাহ না করুন যদি ওর স্বামী রিসিভ করে, তাহলে? তাহলে আমি কি কোনো কথা বলতে পারবো? প্রেমিকার স্বামীকে কখনো কি আপন ভাবা যায়? আমার আজন্ম অক্ষমতার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে যে মানুষটা আমার জীবন থেকে ওকে লুট করে নিয়ে গিয়েছিল, তাকে কি আজ আমি বন্ধু ভাবতে পারবো? না। পারবো না।

এসব চিন্তার বাতাবরণে আমি যখন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি ঠিক তখন আমার কানের মধ্যে একটা মিষ্টি শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর ভেসে এল...

হ্যালো কে বলছেন?

আহা কতদিন পর আবার সেই কণ্ঠস্বর! আমি কেমন করে এ প্রলয় রাতে ও প্রতিমার পায়ে পুজো রাখি!! আমি কোনো কথা বলতে পারলাম না। ও প্রান্তে আমার সুদূরিকা তখনো তন্দ্রাচ্ছন্ন গলায় ভালোলাগার তুমুল আবেশ ছড়াচ্ছে... হ্যালো কে... কথা বলছেন না কেন... কে আপনি?

আমি কোনোমতে উচ্চারণ করলাম, হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন্স ডে টু ইউ। এই রাত দুপুরে এমন আচমকা একটি কথার সুদূরিকা যেন বিস্ময়ে বিভোর কিংবা বিচলিত হয়ে পড়েছে। কম্পিত কণ্ঠে ও বলল... কে আপনি?

: চিনতে পারছো না?

: না।

: কি করছিলে... ঘুমিয়ে পড়েছিলে?

: প্লিজ আগে বলুন কে আপনি।

: শিশির।

: তুমি মানে শিশির... এতদিন পর!

: বিরক্ত করলাম না?

: আবার তোমার সাধ হলো আমাকে কষ্ট দেবার।

: এ তোমার মিথ্যে অভিযোগ।

: আমার নাম্বার পেলে কোথায়?

: যুগ অনেক বদলে গেছে সুদূরিকা। মোবাইল আর ইন্টারনেটের এই যুগে মানুষ কেউ আর কারো থেকে দূরে নয়। শুধু তুমি আর আমি ছাড়া।

: তুমি পাঁচ মিনিট পরে রিং দাও। আমি ছাদে যাচ্ছি। এখানে ও ঘুমোচ্ছে। শুনে ফেললে...

: শুনে ফেললে কি হবে?

: কি হবে বোঝ না। তোমরা পুরুষ জাতটা কত যে সন্দেহপ্রবণ...

আমি বাধা দিলাম.... সমাজের আর দশটা

NESCAFÉ
Instant Coffee

পুরুষের সঙ্গে অন্তত আমাকে তুমি মিলিয়ে দিও না।

: আচ্ছা ধর... তোমার বউ যদি এই গভীর রাতে তার আগের প্রেমিকার সঙ্গে এভাবে কথা বলতো... ব্যাপারটা তুমি কীভাবে নিতে।

আমি নীরব। কোনো কথা বলতে পারলাম না। সুদূরিকা বলল, দেখ শিশির, বাস্তবতা জিনিসটা খুব জটিল ও যন্ত্রণাদায়ক। এই গভীর রাতে তুমি আর আমি অনেক দূরে। আমরা হয়তো কোনো পাপ করছি না। তবু সমাজ কিন্তু মানবে না এসব।

: হয়তো তুমিই ঠিক। তবু আজ ১২টি বছর ধরে যার পাশে শুয়ে আছে তাকে কেন আজও বুকের জমানো কষ্টের কথাগুলো বলতে পারলে না? কেন দেখাতে পারলে না ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়টাকে? এ তোমার কেমন জীবনসঙ্গী?

: প্লিজ শিশির বাজে বকো না। পাঁচ মিনিট পর রিং দাও।

: না- আর ফোন করবো না। তুমি ঘুমিয়ে পড়।

: রাগ করেছ?

: না।

: তাহলে?

: তোমার কোনো ক্ষতি করবার ইচ্ছে নেই।

: শিশির, আমি এখন শুধুই একটা নারী। ক্ষয়ে যাওয়া অস্তিত্ব। পূর্ণিমা চাঁদটা একটু একটু করে ক্ষয় হতে হতে যেমন ফুরিয়ে যায় তেমন। আমি ছাদে চলে যাচ্ছি... একটু পর রিং কর।

**৩.**

আমি চলে গেলাম সুদূরিকার কাছে। যেখানে মোবাইল হাতে ডিম লাইটের মৃদু আলোয় হতবিহ্বল সুদূরিকা স্থির দাঁড়িয়ে আছে। সম্মুখে সুন্দর পরিপাটি বিছানায় স্বামী ঘুমিয়ে, পাশে প্রিয় সন্তান। ওর চোখ দুটি অশ্রুতে টলমল। একদিকে শিশির... অন্যদিকে স্বামী-সন্তান। কোনটা সত্য? হয়তো দুটোই। না। সংসার এবং প্রেম একসঙ্গে চলতে পারে না। শিশির আজকের পর তুমি আর কখনো আমাকে পরাজিত করে দিতে এসো না।

এসব ভাবতে ভাবতেই হয়তো সুদূরিকা ধীরে ধীরে উঠে গেছে ছাদে। যাবার আগে ও হয়তো গভীর দৃষ্টিতে একবার চেয়ে দেখেছে ঘুমন্ত স্বামীর মুখ। যে মুখে কোনো পাপ কিংবা প্রতারণা নেই।

**৪.**

বহুক্ষণ আগে পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে। আমি ইচ্ছে করেই দেরি করছি। সুদূরিকা অপেক্ষা করুক! নির্জন রাত্রির অন্ধকারে নীল আকাশটার নিচে দাঁড়িয়ে ও প্রতিটি মুহূর্ত অজানা এক শিহরণ ও আতঙ্ক নিয়ে অপেক্ষা করুক। আমি ওকে কষ্ট দিতে চাই... অনেক কষ্ট...!

**APL-2, Lot- 12, Medan Tasek**
**31400-IPOH, Perak, Malaysia**

---

# মন কাঁদে

**মোঃ সাইফুল দোলন**

অফিসের কাজে চিটাগাং গিয়েছিলাম। সেখানেই দেখা অনিকের সঙ্গে। অনেক দিন পর দেখা। প্রায় এক বছর। বিয়ের মাস দুই পর্যন্তও যোগাযোগ ছিল অনিকের সঙ্গে। মনে আছে, অনিকের বিয়েতে বেশ মজা করেছিলাম সব রুমমেট বন্ধুরা মিলে। যদিও তা সেটেল্ড ম্যারেজ ছিল না। বিয়েটা হয়েছিল গত বছর (২০০৫)-এর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে। সেদিন গুলশানের একটা চাইনিজে ৮/১০ জনের একটা সার্কেল নিয়ে পার্টি দেয়া হয়েছিল। এজন্য অবশ্য আমাদের প্রত্যেককেই কম বেশি ডোনেট করতে হয়েছিল। ফ্যামিলিতে জানাজানির পর অনিকের বাবা এ বিয়ে মেনে নেননি। এ কাজে সহযোগিতার জন্য আমাকে ওনার অনেক তিক্ত কথা শুনতে হয়েছিল। কারণ, আমি ছিলাম অনিকের খুব কাছের বন্ধু। ওদের বাসায় অনেক গিয়েছি, থেকেছি। ওদের ফ্যামিলি মেম্বারের মতোই ছিলাম। কিন্তু অনিকের এ ব্যাপারটার জন্য আমি তাদের সবার চক্ষুশূল হয়ে গেলাম। ওদের বক্তব্য হলো, আমি ছিলাম এটার চিফ অ্যাডভাইজার। আমার কারণে নাকি এমনটি হয়েছে। ওদের কথাগুলো কতোটা যুক্তিযুক্ত ছিল জানি না। তবে, অনিকের সঙ্গে জলির (অনিকের স্ত্রী) সম্পর্কের শুরু থেকে বিয়ে পর্যন্ত আমি আসলেই একজন সক্রিয় সহযোগী ছিলাম বটে! অনিকের বিয়ে-ঝামেলার পর চিটাগাং গেলেও ওদের বাসায় আর যাওয়া হতো না। ওদের ফ্যামিলির সঙ্গেও আর যোগাযোগ রাখিনি। বিয়ের এক মাসের মধ্যেই অনিককে ওদের কোম্পানির খুলনা অফিসে ট্রান্সফার করা হয়। অনিক আমাদের মেস থেকে বিদায় নেয়।

প্রতি সপ্তাহে অনিক খুলনা থেকে তার শ্বশুরবাড়ি মানিকগঞ্জ যাতায়াত করে। ওর শ্বশুরপক্ষ অবশ্য বিয়ের ব্যাপারে তেমন আপত্তি তোলেনি। বরং অনিকের মতো সুদর্শন এবং কোয়ালিফাইড জামাই পেয়ে তারা বেশ প্লিজড। প্রায় মাসখানেক পর একদিন ফোন করে জানতে পারি অনিক বউকে তার কাছে নিয়ে গেছে। বেশ সুখেই আছে দু'জন- জেনে খুব ভালো লাগলো।

এক সময় যোগাযোগটা কমে যেতে যেতে বন্ধ হয়ে গেল। ভাবলাম দাম্পত্য সুখের

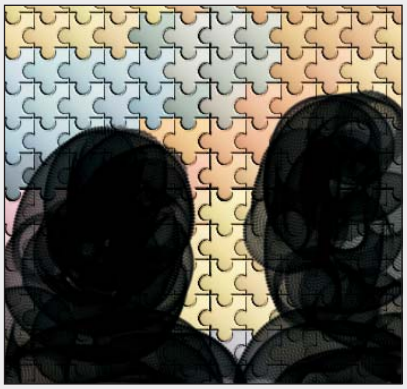

# এপিসোড : হঠাৎ দেখা

**এস এম নূরুল মোমেন**

বছর তিনেক পরে নিউমার্কেটের মেইন গেটে তাপসীর মুখোমুখি দাঁড়াতে ও চোখ কপালে তোলে, আরে তুমি? অপ্সরী তাপসী হাফ ছেড়ে বাঁচে, যাক বখাটেগুলো এবার পিছু ছাড়বে। ওর কণ্ঠে কোনো অভিযোগের বাক্যাবলী নেই, এতে বিন্দুমাত্র অবাক হই না। সেই পুরনো কণ্ঠে জানতে চাই, কেমন আছো? ওর উচ্ছ্বাসপূর্ণ জবাব, খুব ভালো। আমরা তিন বছর আগের গোধূলীঘেরা সময়ের পরবর্তী বিকেল চিত্রায়ণ করছি।

আমাদের অনেক পছন্দের মধ্যে অন্যতম পছন্দ ছিলো হুড ফেলা রিকশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরে বেড়ানো। ঈদপূর্ব হৈ চৈ মুখরিত শহরে আবারও তাপসীর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে বেশ ভালো লাগে। দু'জনের আলাপের মওতায় দুনিয়ার অন্যসব একদম ভুলে যাই। তাপসীর ঘর-সংসারের গল্প জানতে ইচ্ছে করে। সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেও আনমনা হয়ে ওঠে। আমি অবস্থার প্রতিকূলতা দেখে 'সরি' বলে থামি। ও সমর্পিত কণ্ঠে জানায়, তুমি দেশে ছিলে না। তোমার কিছুই করার ছিলো না। তবে আমার সব খবরই তুমি জানতে পারো। আমি উদাস হয়ে আকাশে তারা খোঁজে বেড়াচ্ছি। খানিক পরে তাপসী নিজের মৌনতা ভাঙে, কায়সার রাজশাহীর প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। ব্যবসায়িক ব্যস্ততা ছাড়াও পার্টি-ড্রিংক্স্ নারীসঙ্গ ওকে ভীষণ ব্যস্ত রাখে। এসব শোনে দমে যাই, আমার প্রতীক্ষা দমে যায়। প্রিয় নারীটির জীবনের এমন দুঃসংবাদ শোনার জন্যই কি অধীর অপেক্ষায় ছিলাম? নিজেকে খুব ছোট লাগে।

জানো অমিত, তারপরও সব মানিয়ে চলতে চেয়েছি। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে আম্মার সঙ্গে থাকতে শুরু করি।

লিগ্যাল সেপারেশনের কথা ভাবছো না কেন?

ভাবিনি যে তা নয়। তবে এ নিয়ে এক পা এগুলে দু'পা পিছিয়ে যাই- ওর দু'চোখ জলে ভরে ওঠে। হঠাৎ ও নিজেকে সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, রাখতো এসব কথা। জীবন তো পুষ্পশয্যা নয়, এখানে এক-আধটু ঝামেলাতো থাকবেই।

ত্যাগের মহিমায় তাপসী সর্বদা অতিজ্জ্বল। আমার ভেতর বাড়িতে বৈরী অবস্থা সৃষ্টির আগেই ও এ কথা ও কথা দিয়ে নিজেকে সুখী বানাতে তৎপর হয়ে ওঠে।

তাপসীর মোবাইল বাজে। ও ফ্রেশ গলায় মোবাইলে কথা বলতে থাকে, তুমি ঢাকায় এসেছো! আমি একটু জরুরি কাজে বের হয়েছি। এক্ষুণি ফিরছি। তুমি এ ফাঁকে ফ্রেশ হয়ে নাও। তাপসী মোবাইলটা পাশে রেখে ঠোঁটে কৃত্রিম হাসি জড়ো করে, কায়সার এখন আমাদের বাসায়। আগামীকাল আমরা রাজশাহী চলে যাবো। ওর বলার প্রতিত্তুরে বলতে ইচ্ছে করে, না, তুমি ঐ অমানুষটার সঙ্গে কোথাও যাবে না। কিন্তু পারি না, বীণার জন্য কেনা সদ্য এনগেজমেন্টের রিংটা আমার কণ্ঠ চেপে ধরে। বীণাও স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে।

অতি স্বার্থপরের মতো দ্রুত বাসায় পৌঁছাতে তাপসীকে ট্যাক্সি ক্যাব ঠিক করে দেই। ও ক্যাবে উঠে বলে, আজীবন অন্তত এমনি করে দেখা হোক। তোমার পাশে এ রকম এতোটুকু সময় কাটাতে পারলেই ভুলে যেতে পারবো জীবনে ঘটে যাওয়া সব দুঃখ-কষ্ট। তাপসীর হাতে হাত রাখি, আমিও এমনটি চাই। ঠিক যাবার মুহূর্তে ও বলে, বীণা খুব ভালো মেয়ে। তুমি কখনো ওকে কষ্ট দিয়ো না। তোমাদের নতুন জীবন অনন্ত সুখের হোক। তাপসীর গলায় দারুণ চঞ্চলতা, এমনি করে হঠাৎ হঠাৎ দেখা হলেই চলবে। অন্তত শুভ প্রার্থনাগুলো মুখোমুখি বলা যাবে। হাতের পিঠে তাপসীর চোখের কোণ মোছাটা আমার দৃষ্টি এড়াতে পারে না।

ক্যাবের অদৃশ্য হওয়া পথে একটানা তাকিয়ে থাকি। আমিও তাপসীর জন্য প্রার্থনা করি, তুমিও কায়াসরকে পুরোপুরি তোমার করে পাও।

**পান্থ নিবাস # ০৪, ফ্ল্যাট # ৪০১**
**জনতা হাউজিং, মিরপুর-১**
**ঢাকা ১২১৬**

মাঝে থেকে বন্ধুর কথা ভুলেই গেছে অনিক। কিছুটা খারাপ লাগলো। তবু কামনা করলাম যাতে ওরা চিরসুখী হয়।

বহুদিন পর বন্ধুকে কাছে পেয়ে কফির ফাঁকে তার কুশলাদি জিজ্ঞেস করছিলাম। এমন সময় তার মোবাইলটা বেজে উঠলো। কথোপকথন দেখে বোঝা গেল মেয়ে মানুষের ফোন। ফোন রাখলে জিজ্ঞেস করলাম- তোর বউয়ের ফোন?

- না

- আচ্ছা, এবার বল তোর দিন কেমন যাচ্ছে? জলি কেমন আছে?

- আমার ভালো যাচ্ছে। জলিরটা জানি না।

- কেন, কি ব্যাপার, জলি কোথায়?

- জানি না।

সেদিন অনিক জানাল, বিয়ের সাত মাসের মাথায় জলির সঙ্গে তার সম্পর্ক চুকে যায়। দুজনের সমঝোতাতেই নাকি এই সেপারেশন। শুনে আকাশ থেকে পড়লাম যেন- এমন ভালোবাসার সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত ভেঙে গেল! কারণ জানতে চাইলে বলল, 'বনিবনা হয় না। তাছাড়া আগের মতো ভালো লাগে না। একটা শরীর দেখতে দেখতে আর একটা মুখের কথা শুনতে শুনতে চোখ-কানে একদম জ্বালা ধরে গেছে। কোন এট্রাক্শন নেই... ।' কথাগুলো শুনে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম অবাক হয়ে। এই অনিককে আমি যেন কখনো দেখিনি। বড়ই অচেনা মনে হলো তাকে। একটা সময় যে অনিক মোবাইল কানে রেখে জলির সঙ্গে কথা বলে রাতটা ভোর করে দিতো, জলিকে একদিন না দেখে থাকতে পারতো না, জলির জন্য একদিন যে অনিক পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল সেই অনিকের মুখে কথাগুলো শুনে নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছিল না। যেন ভুল কিছু শুনছিলাম। এখন অনিক তার বাবার বন্ধুর মেয়ে এশার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। বিয়েও নাকি করবে। নিজেই জানাল অনিক।

অনিকের সেদিনের কথাগুলো শুনে 'ভালোবাসা' শব্দটির প্রকৃত অর্থ নিয়ে বেশ দ্বন্দ্বে আছি। জলির সঙ্গে অনিকের সম্পর্ক, বিয়ে এবং অতঃপর ক'মাসের দাম্পত্য জীবন তার নাম কি ভালোবাসা? নাকি এখন তার বাবার বন্ধুর মেয়ের সঙ্গে যে সম্পর্ক তার নাম ভালোবাসা? তাহলে, চার বছর আগে ভ্যালেন্টাইন্স ডে'তে বেড়াতে গিয়ে রাস্তা পারাপারের সময় দুর্ঘটনায় হারানো মল্লিকার স্মৃতি বুকে নিয়ে বন্ধু কাঞ্চনের বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেয়ার যে সিদ্ধান্ত, তার নাম কি...?

আসলে ভালোবাসা বিষয়টা আমার কাছে বরাবরই জটিল মনে হয়। গল্প-উপন্যাসে ভালোবাসার কথা পড়েছি, ভালোবাসার নাটক দেখেছি, বন্ধু-বান্ধবদের ভালোবাসাবাসিটাও দেখেছি; কিন্তু বৈচিত্র্যময় এ ভালোবাসার আসল চিত্রটা যে ফোনটা, সেটাই আবিষ্কার করতে পারলাম না আজও। অর্থাৎ 'ভালোবাসা'টা যে কী তা-ই জানা হলো না। যারা ভালোবাসে তারাই কি জানে- ভালোবাসা কারে কয়...?

**৭৬/২, হাজী সুপার মার্কেট**
**মহাখালী, ওয়্যারলেস গেইট**
**গুলশান, ঢাকা-১২১২**

# বার্লিনের পথে

**ফকির মুসাফির**

নওশাদ পেশায় মোটর মেকানিক। জার্মানির বার্লিন শহরের উপকণ্ঠে তার গ্যারেজ। অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও প্রভাতে সে কাজে লেগেছিলো। প্রতিদিন যাতায়াতের সুবাদে জুলিয়ানা লুশি নওশাদকে দেখতো। তার নিজের গাড়িটা খারাপ হলেই এখান থেকে মেরামত করিয়ে নিত। আজও জরুরি প্রয়োজনে প্রত্যুষে লুশি ছুটে আসে সেখানে। আগের দিন তার গাড়িটা রেখে গিয়েছিল। তাকে দেখে একগাল হেসে নওশাদ বলে, আপনার গাড়ি ডেলিভারি হবে তো বেলা বারোটায়, এখন মাত্র সাড়ে ছ'টা। আচমকা নওশাদের কালিমাখা ডান হাতখানি চেপে ধরে সে বলে, তোমাকে ভালো প্রেজেন্ট করবো, প্লিজ আমার ভীষণ তাড়া'। 'ওকে মেমসাব দিচ্ছি' বলে কাজে লেগে যায় ও। ৪০ মিনিটের মধ্যে লুশির গাড়ি প্রস্তুত হয়ে যায়। স্টিয়ারিংয়ে বসে একটি চক্কর মেরে এসে চাবিটা তুলে দেয় লুশির হাতে। ২৭/২৮ বছর বয়সী যুবতী লুশি এ সময় সম্বিত ফিরে পায়। এত দ্রুত এবং এত মনোযোগ ও একাগ্রতায় সে কাজ করছিলো যে, লুশি মুগ্ধই নয়, বিমোহিত হয়ে পড়েছিলো। মজুরি ছাড়া আরো বাড়তি কিছু দিলে নওশাদ হাসিমুখে তা প্রত্যাখ্যান করে। 'লাগবি না, আমাদের কাজই এই'। ওর সরলতা ও নির্মোহ হাসিতে লুশি অভিভূত হয়। ২৪ বছরের টগবগে যুবক নওশাদ। ঘামে জবজব করছে বলিষ্ঠ দেহখানা। লুশি ফিসফিসিয়ে ডাকে- খাম অন। মৃদু হেসে এগিয়ে আসে ও। লুশি আচানক ওর ওষ্ঠে এক চুম্বন এঁকে দেয়। ঘটনা এতো দ্রুত ঘটে যে, নওশাদ ভড়কে যায়। ও বাম হাতে ওষ্ঠে যেখানে লুশি চুমো দিয়েছে চেপে ধরে, তড়িতাহত মানুষের মতো ফ্যালফেলিয়ে চেয়ে থাকে। লুশি হেসে লুটোপুটি খায়।

এখানকার লোকেরা পরস্পরকে চুমো খায় ও দেখে কিন্তু সেই শ্বেত বর্ণা কোন বিদেশিনী ওকে এভাবে চুম্বন করবে তা সে ভাবতেই পারেনি কখনো। ও এদিক ওদিক চেয়ে দেখে আর কেউ দেখেছে কিনা।

# ভালোবাসার প্রাপ্তি

স্মার্ট, হাসিখুশি, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্র রূপম তার মধ্যে আদর্শ নারীর বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছে চৈতির মাঝে। সে প্রস্তাব দিলেও চৈতি সুকৌশলে না করে দেয়। রূপম এতো ভালোবাসে, হাল ছাড়তে রাজি নয়। একদিন হলের ফোনে কল দেয়। ফোন নং....। কক্ষ নং....

হলের খালা চৈতিকে ডেকে দেয়।

হ্যালো... কে বলছেন?

কে চৈতি?

জি, আপনি কে বলছেন?

রূপম বলছি...।

কী? আবার ফোন করেছেন কেন? প্লিজ আমাকে আপনি আর...

লাইন কেটে দিও না প্লিজ! বিশ্বাস কর, একটি গল্প বলার জন্য ফোন করেছিলাম, তোমার ঐ 'না' করা নিয়ে। প্লিজ গল্পটি শোন। ওপাশ নিস্তব্ধ, রূপম প্রশ্রয় পেল। গল্প শুরু করল- 'একটি নাচের অনুষ্ঠানে আধুনিক জার্মানের জনক বিসমার্ক নর্তকীকে নানা মিষ্টি কথায় বশে আনার চেষ্টা করছেন। নর্তকী তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বললেন, আমরা আপনাদের মতো রাজনীতিবিদদের মিষ্টি মিষ্টি কথায় ভুলি না। কারণ আপনারা যখন 'হ্যাঁ' বলেন, তখন 'সম্ভবত' বোঝান। আর যখন 'সম্ভবত' বলেন তখন 'না' বোঝান। আর যখন 'না' বলেন, তখন রাজনীতিবিদই না। আমরা মেয়েরা ঠিক উল্টো। আমরা যখন 'না' করি তখন 'সম্ভবত' বোঝাই আর যখন 'সম্ভবত' বলি তখন, 'হ্যাঁ' বোঝাই। আর যিনি সরাসরি 'হ্যাঁ' বলেন, তিনি কোনো মেয়েই না।

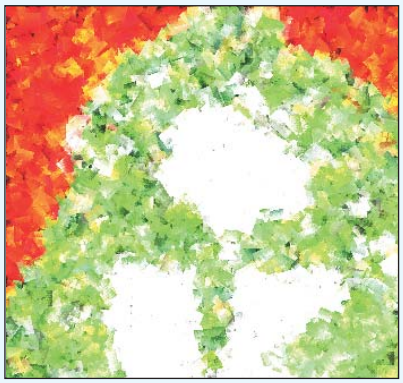

(কর্কশ কণ্ঠে) গল্প দিয়ে আপনি কী বোঝাতে চান?

না মানে.. তুমি আমাকে না করেছ... (হেসে পরিবেশটাকে কন্ট্রোল করতে চাইল)

আপনি আমাকে এভাবে ডিস্টার্ব করছেন কেন?

আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই চৈতি। ফোন কেটে দেয়। রূপমের ভাবনা বাড়তে থাকে...

বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে আবার ফোন। আবার ফোন করেছেন কেন? আমি এখন ইন্ডিয়ান আইডল দেখছি। আপনিও দেখেন না? যান, টিভি দেখেন, অভিজিতের গান হচ্ছে....

রূপম কথা ঘুরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে।

না, মানে, একেকজন একেক চ্যানেল দেখার জন্য রিমোট নিয়ে টানাটানি করে। এটা তো আর আমাদের বাড়ি...

কথা শেষ না হতেই আর কখনো কল না করতে বলে চৈতি ফোন কেটে দেয়।

সামনে ১৪ ফেব্রুয়ারি, 'বিশ্ব ভালোবাসা দিবস'। এ দিন হয়তো আমাকে অন্তত ফিরিয়ে দেবে না। রূপম হলমার্ক থেকে ভ্যালেনটাইন ডে'তে চৈতিকে গিফট করার জন্য কার্ড কেনে। সাদামাটা কার্ড। কার্ডের ভেতরে মনের মাধুরী মিশিয়ে নিজের কাল্পনিক কথাগুলো সাজিয়ে লেখার চেষ্টা করে রূপম। তারপর কার্ডের ওপর তিনটি গোলাপ এঁটে দিয়ে বন্ধুর মাধ্যমে চৈতির কাছে পাঠায়। মনের মধ্যে একটি ভয় কাজ করে রূপমের।

কার্ডটি সঙ্গে সঙ্গে খোলে চৈতি...

'তুমি আছো, থাকবে...'

...গন্তব্য শুধু তুমি

চৈতির মুখের শুধু একটাই কথা।

রূপমকে আমার সঙ্গে সন্ধ্যায় দেখা করতে বলবেন। সংবাদ শুনে রূপম মনে মনে ভাবতে থাকে, স্বপ্ন এবার সত্যি হবে। রূপমের খুশি আর ধরে না। নির্দিষ্ট সময়ে সে ফিটফাট হয়ে চৈতির হলের সামনে যায়। নিমিষেই যে তার স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন হয়ে যাবে সে কি জানতো? নিশ্চয়ই জানতো না।

বিদেশে পড়ুয়া তার প্রেমিকের হাতে ধরে (ছুটিতে দেশে এসেছে) রূপমের সামনে এসে কার্ডটি বুলেটের গতিতে ছুঁড়ে দিয়ে চলে যায়...

আর হতভাগা রূপম কার্ডটি কুড়িয়ে বুকে আগলে রেখে নীরবে বুক ভাসিয়ে নিজের হলের দিকে পা বাড়ালে পেছন থেকে তার পিঠে হাত দেয় মুক্তি। যে মেয়েটি এতো দিন শুধু রূপমকে নিয়ে নীরবে স্বপ্ন দেখেছে, কিন্তু মুখ খুলে বলতে সাহস পায়নি। তারপর...

**নাম-ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক**

লজ্জায় সে আর লুশির দিকে তাকাতে পারে না। লুশিই হাত ধরে টেনে গ্যারেজের ভিতরে নিয়ে যায়। ওর দু'কাঁধে দু'হাত তুলে দিয়ে বলে টুডে ইজ মাই বার্থডে, ইউ আর দি গ্রেট'।

একটি রপ্তানিমুখী অফিসে নির্বাহীর কাজ করে লুশি। ইদানীং নওশাদকে প্রায়ই অভিসারে নিয়ে যায় সে, হোটেলে নিয়ে খাওয়ায়। নওশাদ ইংরেজি বলতে পারে না। লুশি শিখাতে চায়। কিন্তু নওশাদ আপত্তি করে 'আমাকে ভালোবাস?' 'অফকোর্স।' লুশি বলে। 'তাহলে আমার বাংলাই তোমাকে শিখতে হবে।' নিজের ভাষার প্রতি টান দেখে লুশি মুগ্ধ হয়। কিছুকাল পর বিয়ের কথা বলে 'চলো আমরা বিয়ে করবো।' নওশাদ বেঁকে বসে- 'মুসলমান-খ্রিষ্টান বে হলি পাপ হবি না?' লুশি ভুল ভেঙে দেয়। ওসব ধর্মাধর্ম মানুষের তৈরি। ওখানে ঈশ্বরের হাত নেই। তার কাছে সকল মানুষ সমান। ধর্ম কর্ম জাত কূল ধান্দাবাজি বুজরকী এতে বিশ্বাস এনো না। মানবতা বড় ধর্ম।' লুশির কথা বিশ্বাস হয় ওর। সম্মত হয় আগামী ভ্যালেন্টাইন ডে'র পরেই বিয়ে করবে ওরা।

এসময় লুশি ওর বুকে স্থান পায়। 'নাও আমাকে। বেশি করে নাও আমাকে। বেশি করে নাও। তোমার বলিষ্ঠ বুকে আমাকে পিষে ফেলো।' দু বাহুতে ঝাপটি ধরে নওশাদ। চুমায় চুমায় ভরে দেয়। কথা হয় আগামী ভ্যালেন্টাইন ডে'তে তারা লং ড্রাইভে যাবে। কিন্তু আগের দিন ফোন আসে গ্যারেজে 'জরুরি প্রয়োজনে লুশিকে মিউনিখে যেতে হচ্ছে'। নওশাদ যেন চলে যায়। লুশি পরে ওর সঙ্গে অমুক জায়গায় মিলিত হবে।

কথামতো গ্যারেজ থেকে একটি মেরামত করা গাড়ি দিয়ে আসে নওশাদ। প্রচন্ড ঠান্ডায় বার্লিনের রাস্তায় সেদিন বরফ পড়ছিলো। প্রেয়সির টানে সে সব উপেক্ষা করে শহর ছেড়ে প্রায় ২০০ কি.মি চলে আসে নওশাদ। অপেক্ষা করে লুশির জন্য। অবিচল বিশ্বাস তার লুশি আসবেই। অত্যধিক তুষারপাত আর শৈত্যপ্রবাহে লুশির নির্ধারিত ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় লুশি বার্লিনে ফেরে রাতে। এদিকে বরফ জমতে জমতে নওশাদের ফেরার রাস্তাও বন্ধ হয়ে যায়। গাড়ির অর্ধেকটা ঢেকে যায় বরফে। ইঞ্জিন স্টার্ট করে গাড়ির মধ্যে বসে থাকে। কিন্তু জ্বালানি নিঃশেষ হয়ে ইঞ্জিন থেমে যায় এক সময়। হিমশীতল ঠান্ডায় ও ক্রমে জমতে থাকে।

মৃত্যুর বিভীষিকা কল্পনা করে কেঁদে ওঠে নওশাদ। এ সময় হৃদয় দর্পণে লুশির ওষ্ঠরাঙা হাসি মুখটি বারবার ভেসে ওঠে। বুঝতে পারে মৃত্যু তার অবধারিত আজ বাঁচার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে মনে কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তি বাঁচতে দেয় না। গাড়ির স্টিয়ারিংয়ের উপরই ঢলে পড়ে। ভোর হলে লুশি ছুটে আসে গ্যারেজে, কাল আসতে না পারার কৈফিয়ৎ দিতে। এসে জানতে পারে নওশাদ কাল ফেরেনি।

পত্রিকার সংবাদ- 'তুষারপাতে গাড়ি আটকে শহরের বাইরে অনেক আরোহীর মৃত্যু।'

বুকের ভিতরটা চিন্‌চিনিয়ে ওঠে লুশির। তবে কি তার নওশাদও...? না না, এ হতে পারে না। ডুকরে কেঁদে ওঠে। সরকারি বেসরকারি হেলিকপ্টারে অনেকে যায় তাদের প্রিয়জনের সন্ধানে। লুশিও সঙ্গী হয়।

ঘটনাস্থলে এসে সে কঠিন সত্যের মুখোমুখি হয়। বরফ সরিয়ে দরজা খুলে সে আবিষ্কার করে তার নওশাদ বেঁচে নেই।

স্টিয়ারিংয়ের গোড়ায় চিরকূট, তাতে লেখা ছিলো- আমি জানি তুমি আসবেই। মৃত্যুর পূর্বক্ষণেও আমি তোমাকে ভুলিনি।

লুশি কেঁদে বরফের উপর লুটিয়ে পড়লো। বার্লিনের সরকারী কবরস্থানে নওশাদ সমাহিত হয়। প্রতি ভ্যালেন্টাইন ডে'র প্রভাতে লুশি অশ্রুসিক্ত নয়নে নওশাদের সমাধিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে।

**ফকির মুসাফির**
**সেরেস্তাদার, জজকোর্ট**
**শরীয়তপুর**

---

# না বলা কথা

**বিপ্লব কুমার পাল**

প্রথমবার বাড়িতে বিশ্বাস এখন নিজের বাড়ির মতোই যাতায়াত করে। হাইস্কুলে পড়ার সময় বন্ধুত্ব হয় প্রথমবার ভাই সোহেলের সঙ্গে। সেই থেকে বাড়িতে যাতায়াত। প্রথমার মা-বাবা বিশ্বাসকে নিজের সন্তানের মতো স্নেহ করেন। বাড়ির প্রয়োজনে সোহেলের আগে ডাক পড়ে বিশ্বাসের।

বিশ্বাস মাস্টার্স পাস করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে। প্রথমা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। আর প্রথমার ভাই সোহেল ব্যবসা করেন। প্রথমার বাবা সরকারি ব্যাংকে চাকরি করেন।

অফিসে যাবার সময় প্রথমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে দেয় বিশ্বাস। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার সময় প্রথমার সঙ্গে পরিচয় হয় বিশ্বাসের বন্ধু সুজার। পরিচয়টা বিশ্বাসই করিয়ে দেয়। এরপর মাঝে মাঝে প্রথমার সঙ্গে দেখা হতো সুজার। কখনো কখনো আইসক্রিম, ফুচকা খেতো সুজার সঙ্গে। সুজা প্রথমাকে ভালোবেসে ফেলে। যদিও সরাসরি প্রথমাকে বলতে পারে না। তাই শরণাপন্ন হয় বন্ধু বিশ্বাসের। বিশ্বাস 'ভালোবাসা' কথাটি শুনেই চমকে ওঠে। সুজা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে। অবশেষে বিষয়টি বোঝানোর দায়িত্ব নেয় বিশ্বাস। সুজার 'ভালোবাসা'র কথাটি প্রথমাকে বলে। প্রথমা সেই প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বিশ্বাসকে বলে, তুমি এ কথা আমাকে বলতে পারলে! তবুও নাছোড় বিশ্বাস। একদিন বেড়ানোর কথা বলে সুজার সঙ্গে প্রথমার একান্ত কথা বলার সুযোগ করে দেয় বিশ্বাস। সুজা প্রথমাকে তার ভালোবাসার কথা জানায়। প্রথমা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

সুজার ভালোবাসার প্রস্তাবের বিষয়টি জেনে যায় প্রথমার ভাই সোহেল। এ নিয়ে সোহেলের সঙ্গে বিশ্বাসের কথা কাটাকাটি হয়। সোহেল বিশ্বাসকে বাড়িতে আসতে নিষেধ করে। এরপর থেকে প্রথমার বাড়িতে যাতায়াত বন্ধ করে দেয় বিশ্বাস। প্রথমার বাবা-মা জানতে চায় বিশ্বাস কেন বাড়িতে আসে না? সোহেল ও প্রথমা কিছু বলে না। সোহেল এবং তার বাবা ব্যবসার কাজে ঢাকার বাইরে গেছেন। অসুস্থ হয়ে পড়ে প্রথমা। হাসপাতালে নিতে হবে তাকে। প্রথমার মা মোবাইলে বিশ্বাসকে বাড়িতে আসতে বলে। বিশ্বাস দ্রুত বাড়িতে এসে প্রথমাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ডাক্তার জানান, অ্যাপেনডিসাইড অপারেশন করতে হবে। অপারেশন শুরু হয়। প্রথমার মা এবং বিশ্বাস ওটির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।

অপারেশনের পর প্রথমাকে কেবিনে আনা হয়। বাড়িতে যাওয়ার জন্য প্রথমার মাকে অনুরোধ করে বিশ্বাস। প্রথমার মা বাড়িতে চলে যায়। প্রথমার জ্ঞান ফেরেনি, স্যালাইন চলছে। ডাক্তার বলেছেন, ভোরে তার জ্ঞান ফিরবে। সারা রাত প্রথমার পাশে বসে তাকে বিশ্বাস। মাঝে মাঝে প্রথমার চুল নেড়ে দেয়, স্যালাইন ঠিকমতো চলছে কিনা তা দেখছে। ভোরের কিছু আগে প্রথমার বুকের কাছে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে বিশ্বাস। ভোরে জ্ঞান

ফেরে প্রথমার। জেগে দেখে বিশ্বাস ঘুমিয়ে আছে। বিশ্বাসের মাথার চুল নাড়তে নাড়তে প্রথমা অতীতের কথা ভাবতে থাকে...

প্রথমার সামান্য মাথা ব্যথায় বিশ্বাস কতোটা উদ্বিগ্ন হতো। প্রথমার মাথা টিপে দেয়া, জোর করে ওষুধ খাওয়ানো। অথবা খাবার টেবিলে সবাই বসে আছে, কিন্তু প্রথমা অভিমান করে নিজের ঘরে বসে থাকে। বিশ্বাস কোলে তুলে এনে খাবার টেবিলে বাসায়। এরপর জোর করে প্রথমার মুখে ভাত তুলে খাওয়ায়। সেই দৃশ্য দেখে সবাই হাসাহাসি করে।

ঘুম থেকে জেগে ওঠে বিশ্বাস। প্রথমা তখনও ভাবছে। প্রথমার গালে হাত দিয়ে ইশারা করে বিশ্বাস। হুশ ফিরে প্রথমা।

প্রথমার বিয়ের কথা হচ্ছে। ছেলে, তার বাবা-মা প্রথমাকে দেখতে এসেছে। বাড়ির সবার সঙ্গে বিশ্বাসও আছে। ছেলে ইঞ্জিনিয়ার, দেখতে সুন্দর। সবার পছন্দ হয়। প্রথমার বিয়ে ঠিক হয় আগামী শুক্রবার। বুকের মধ্যে মোচড় দেয় বিশ্বাসের।

কিছুতেই ভালো লাগছে না বিশ্বাসের। অফিসে কাজ করতে পারে না, ঘুমোতে পারে না। সব সময় প্রথমাকে নিয়ে বিয়ে ঠিক হবার পর শুধু বিশ্বাসকে নিয়ে ভাবছে প্রথমা। বিশ্বাসকে সেও ভালোবাসে। ইচ্ছে করে সব কথা বিশ্বাসকে বলবে।

বিশ্বাস 'ভালোবাসা'র কথা বলার জন্য প্রথমার বাড়িতে যায়। দুজনের মধ্যে অতীতের অনেক কথা হয়। কিন্তু কেউ কাউকে ভালোবাসার কথা বলতে পারে না।

বিয়ের দিন। সবাই আছে। কাজী প্রথমাকে 'কবুল' বলতে বলে। সেখানে বিশ্বাস দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমা একবার বিশ্বাসের চোখে চোখ রাখে। বিশ্বাস তার চোখ মাটিতে নামিয়ে ফেলে। প্রথমা তিনবার 'কবুল' শব্দটি উচ্চারণ করে।

বিয়ের পর স্বামীর বাড়িতে রওনা দেয় প্রথমা। বাবা-মা, ভাইয়ের গলা জড়িয়ে সে কান্না করে। বিশ্বাসের কাছে যায় না সে। প্রথমা গাড়িতে উঠে বসে। গাড়ি চলতে থাকে। গাড়ির দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে বিশ্বাস। বিশ্বাসের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

**বিপ্লব কুমার পাল**
**৫/১৬ হুমায়ুন রোড (৩য় তলা)**
**মোহম্মদপুর, ঢাকা**

---

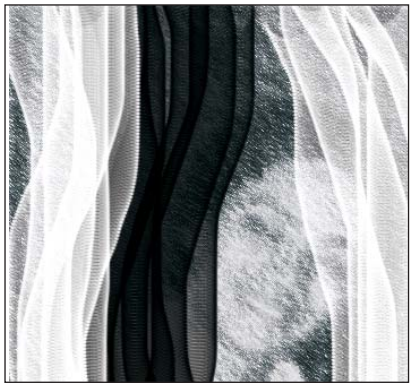

# ভালোবাসা ভালোবাসা

## শ্রাবন্তী

চট্টগ্রাম কলেজ রোড, বৃষ্টিভেজা পথে একাকী হেঁটে চলেছে অন্তরা। একটু আগেই থেমেছে বৃষ্টি, রাস্তার এখানে সেখানে জমে আছে পানি। এখনো আকাশের মেঘ কাটেনি। গাছের সবুজ পাতাগুলো এখন আরো উজ্জ্বল। হঠাৎই চোখ চলে যায় কলেজের সামনের কদমফুলের গাছটায়। ফুল ফুটেছে অনেক। মনে পড়ে যায় আজ থেকে দুই বছর আগের বৃষ্টিভেজা এমনি এক দিনের কথা। শ্রাবণের হাত ধরে এই পথে হেঁটে যাওয়ার সময় গাছটা দেখিয়ে সেদিন সে বলেছিল, 'দেখ শ্রাবণ, বর্ষা আর কদমফুল- একসঙ্গে কী সুন্দর মানায়! কদম ফুল ছাড়া বর্ষার রূপটাই যেন অপূর্ণ।'

'ঠিক যেমন তুমি ছাড়া আমি। হা... হা... হা...' শ্রাবণের বিখ্যাত হাসি আর তাৎক্ষণিক উত্তর।

কী পাগলটাই না ছিল ও।

বাইরে এখন ঝুম বৃষ্টি। ইজি চেয়ারটায় বসে কফির মগে চুমুক দিতে দিতে দৃষ্টি চলে যায় বাইরে। আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে অন্তরার মন কোনো পুরনো দিনের ঘটনায়। সে দিন, যে দিন শ্রাবণের সঙ্গে তার পরিচয়। জোর বৃষ্টি... জিইসি মোড়... দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে... গাড়ি পাচ্ছিল না... বাস থেকে নেমে পাশে এসে দাঁড়াল ছেলেটা। ছাতা খুলতে খুলতে বলল, 'May I help you.' আমি শ্রাবণ। ল'তে পড়ছি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। যা বৃষ্টি পড়ছে, গাড়ি কি পাবেন? বৃষ্টি কখন থামে তারও ঠিক নেই...'

সেই থেকে শুরু। তারপর আবার ভার্সিটিতে দেখা। এরপর আবারও আবারও...। আস্তে আস্তে ভালোলাগা, অতঃপর অন্তরার মোবাইলে একটু একটু কথা, মাঝে মাঝে দেখা। আর সময়ের স্রোতের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলা ভালোবাসার পরিণতির পথে।

ঘোর কাটিয়ে অন্তরা এখন টেবিলের সামনে টেনে নিল পুরনো ডায়েরিটা। খুলতেই চোখে পড়ল।

আমি আর শ্রাবণ। প্রকৃতি আর পলাশ; শিমুল। বসন্ত আর বন্ধুত্ব।

আর পড়তে পারল না, তার আগেই সেদিনের চির জীবন্ত, অমর স্মৃতিগুলো মনের ক্যানভাসে স্পষ্টতর হয়ে উঠল। সারা দুপুর রিকশায় চড়ে হাতে হাত রেখে ঘুরে বেড়িয়েছিল তারা। আর তাদের মন ঘুরে বেড়িয়েছিল কল্পনার রাজ্যে। নতুন নতুন স্বপ্নের গাঁথুনিতে সুখের স্বর্গ রচনায় ব্যস্ত ছিল তাদের চিন্তা, চেতনা। জীবনের প্রতিটি বসন্ত এমনি বর্ণময় প্রকৃতির মতো বর্ণিল করে তোলার স্বপ্নে বিভোর দুই তরুণ-তরুণী সে দিন যেন-

NESCAFÉ
Instant Coffee

হঠাৎ বাজ পড়ার শব্দে চমকে উঠল সে। উঠে এসে দাঁড়াল ড্রেসিং টেবিলের সামনে। আয়নায় প্রতিবিম্ব পড়েছে শ্রাবণের আঁকা ছবি। নদীর বুকে নৌকা। পেছনে অস্তগামী সূর্য। নীড়ে ফিরে চলেছে পাখি। কিন্তু... ও কী! এই ছবির নদীর বুকেই কি ঢেউ লেগেছে? নৌকার পালেও সে হাওয়া লেগেছে। কোথায় চলেছে নৌকাটা?- না, জানে না অন্তরা। তুবও নদীর ঢেউ আর পালের হাওয়া অন্তরার মনকেও সেই অজানা গন্তব্যের যাত্রী করে নিল। ভাসিয়ে নিয়ে গেল সেই দিনের স্মৃতিতে। গত বছরের ২২ মে, অভয়মিত্র ঘাট। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে, অন্তরাকে চমকে দেবার উদ্দেশ্যে শ্রাবণের আয়োজন- নৌকা ভ্রমণ। অন্তরা চমকেছিল বটে। অনেক দিনের সখ পূরণ হবার আনন্দ আর যাত্রী হিসেবে অপ্রত্যাশিতভাবে তার ভালোবাসার মানুষটিকে পাওয়া, সঙ্গে প্রকৃতির অকৃপণ দানের ফলস্বরূপ এবং মোহনীয় পারিবেশের সৃষ্টি- সব মিলিয়ে তারা হয়েছিল বিমোহিত। ঢেউয়ের তালে তালে এগিয়ে চলেছে নৌকা, এগিয়ে চলেছে স্বপ্ন দেখা। হয়তো দূরের কোনো ছায়াঢাকা ছোট্ট কুঁড়েঘর তাদের দেখাচ্ছিল ঘর বাঁধার স্বপ্ন। নদীর বুকে কী যেন খুঁজে চলা বক-পানকৌড়ির দলের মতোই তারা পৃথিবীর বুকের ছোট ছোট সুখগুলোকে এভাবে খুঁজে নিয়ে রচনা করবে ছোট্ট সুখের নীড়। অস্তায়মান সূর্যের আলো

কি তাদের নতুন করে জীবনের দিকগুলো দেখাচ্ছিল?

কম্পিউটার টেবিল। মেইল চেক করতে বসেও ইচ্ছে হচ্ছে না। আপন মনে মেইল ড্রাফট শুরু করল অন্তরা।

তুমি কী বল তো? এভাবে আমাকে একা রেখে যেতে পারলে? যে তুমি আমার সারা দিনমান, সারাবেলা; সেই তোমার সঙ্গে আজ কতদিন...। তুমি ছাড়া যে ভোরগুলো বিষণ্ন, দুপুরগুলো বিমর্ষ, তোমার সাথে কথা না বলা রাতগুলো যে বড়ই নিঃসঙ্গ শ্রাবণ, সারা দিন যে আমার কোনো কাজই হচ্ছে না।

ঝাপসা হয়ে পড়ছে চোখ। ড্রাফট পড়ে রইল। বারান্দায় উঠে এসেছে অন্তরা। অনেক রাত। বৃষ্টি থেমে গেছে অনেকক্ষণ। পরিষ্কার আকাশের বুকজুড়ে হাজার নক্ষত্রের ফুল ফুটে রয়েছে। ওই যে, সপ্তর্ষিমন্ডল...। একদিন শ্রাবণই তাকে চিনিয়েছিল। এই নক্ষত্রগুলো কত দূরে, তবু কী সুন্দর দেখা যায়; এই পৃথিবী থেকেই। অথচ পৃথিবীর মধ্যে থেকেও সব মানুষকে আমরা কি দেখতে পাই?

ভাবনায় ছেদ পড়ল। বেজে উঠেছে মোবাইলটা 'হ্যালো! অন্তরা!'

'শ্রাবণ?'

'হু, কী করছিলে?'

'তোমার কথাই ভাবছিলাম।'

'মন খরাপ?'

'কী করে বুঝলে?'

'আমি ছাড়া আর কে বুঝবে? I know the song of our heart.'

'হয়েছে। আর বলতে হবে না।'

'না, আমি বলব। আজ আমাদের প্রথম দেখা হওয়ার দিন। আমি জানি, তুমি সারা দিন আমাকে মিস্ করেছ। আমার কলের জন্য ওয়েট...'

'শ্রাবণ! তুমি জানো আমার কিছুই করা সম্ভব হচ্ছে না। কোনো কিছুতেই মন বসছে না। তুমি হাসছ! কেন হাসছ? বল, আর কত কষ্ট দেবে আমাকে? ওখানে গিয়ে বুঝি পড়াশোনার মধ্যেই ডুবে গেলে? ফিরো তুমি দেশে। তারপর...'

'তারপর কী? বল না?'

বেড়ে চলে রাত। কথাও বাড়ে। কখনো দূরে থাকার জন্য বেদনা, কখনো রাগ, খুনসুটি, কখনো বা অভিযোগ-অনুযোগ, সঙ্গে যোগ হয় হাসি-ঠাট্টা, মাঝে প্রিয় মানুষকে কাছে পাওয়ার আকুলতা আর চলতে থাকে মনের কথা, মনের মানুষকে মনের মতো করে বলা। এতো ধরনের অনুভূতি মনের আকাশকে ভরিয়ে তুলেছে চিরঞ্জীব ভালোবাসায়।

**srabon-antora@yahoo.com**
**srabonti_14_02@gmail.com**

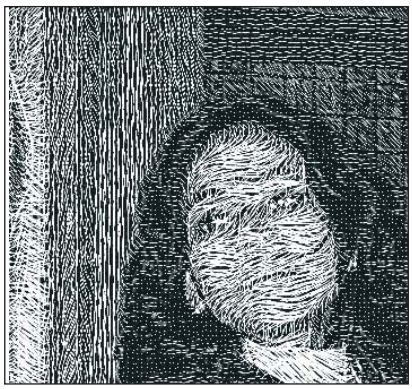

# স্পর্শ

## মহি মুহাম্মদ

বিস্ময়ভরা চোখজোড়া নামায় রিনু। আমিও স্থির। মনের ভেতর ঝড় ওঠে। কেমন আছো? কিছুক্ষণ নিঃশব্দ। তারপর তোমার ছোট্ট প্রশ্ন, আপনি? বারবার তুমি এমনই প্রশ্ন করতে। বহুদিনের পুরনো হাওয়া উথলে ওঠে। হয়তো আমার চোখে-মুখে তার আভাস।

চোখের তারায় ফ্ল্যাশব্যাক।

টেলিফোনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কার্ডফোন। ফোন করার জন্য মেডিক্যাল জিপিও কিংবা দু'নম্বর গেট। কখনো লাইনে দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠায় প্রহর গোনা। টিউশনির টাকা প্রায়ই শেষ হতো এমন করে। কথার জাল বুনতাম দুজনে। এতো কথা কোত্থেকে আসতো বুঝতাম না। হয়তো আমরা কথার জাদুকর এনে গিয়েছিলাম।

তোমার কথায় জানা গেল, গত পাঁচ দিন থেকে তুমিও আমার সতীর্থ। ছুটিতে ছিলাম তাই জানি না। স্কুল ছুটির পর এসে বললে, চলেন। আমি বিমূঢ়। ভেবে নিই সেদিন যদি একবার এমন করে বলতে। আজ আমরা সংসার সাজাতাম। কোনো কথাই শুনলে না। আগের চাইতেও সাহসী। অথচ আগে পথে-ঘাটে কথাই বলতে না। জিজ্ঞেস করলে বলতে, হাটের মানুষের সামনে কথা বলার কী আছে? যে আমার মনে থাকে সে তো একান্তই আমার। পথ-ঘাটের মানুষের সামনে তার প্রমাণ দেবার দরকার নেই।

রিকশায় কখনো সঙ্গে নিতে না। একদিন তো নিউমার্কেট থেকে তোমার রিকশার পিছু ছুটেছিলাম অলিম্পিকের রেসবিদদের মতো। সবাই সেদিন আমাকে পাগল ঠাওরেছে নিশ্চয়ই। আমার খুব জেদ চাপতো। তুমি কেন রিকশায় আমাকে নিতে না। অথচ তোমার-আমার আসা-যাওয়ার পথ একই ছিল। হাতের ইশারায় রিকশা কাছে এলো। তুমি উঠে সরে বসলে। আমি দ্বিধান্বিত। তারপর পাশে উঠি। অস্ফুটে বলি- এ দিন যদি সেদিনে ফিরে যেতো। তুমি তাকালে, বললে দিনের ভেতর দিন লুকিয়ে থাকে, কে জানতো? রিকশা ছুটে। আগে হলে প্রার্থনা করতাম যেন পথ না ফুরায়। কিন্তু এখন পরিস্থিতি উল্টো।

সে সময় একটা দৃশ্য আমার কল্পনায় গেঁথেই থাকতো। তুমি একটা সবুজ মাঠ পেরিয়ে স্লো মোশনে দৌড়ে আসছো। হালকা বাতাসে তোমার শাড়ি উড়ছে। কোথাও রবি ঠাকুরের গান বাজবে :

ভালোবাসি ভালোবাসি

সেই সুরেতে কাছে দূরে জলে-স্থলে-বাজায় বাঁশি

এ দৃশ্যটির কথা প্রায় তোমাকে বলেছি। তুমি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে, খোসা ছাড়ানো পাকা লিচুর মতো আবেগগুলোকে।

তোমার মা ছিল না। চার ভাই। বড় ভাইয়ের সংসারে থাকতে। কলেজে গা বাঁচিয়ে চলতে। সে জন্যই বুঝি নজর কাড়লে। তারপর তোমার দৃষ্টি সীমায় পৌঁছতে আপ্রাণ চেষ্টা। আমরা অন্যদের মতো ছিলাম না। কেউ বুঝতেই পারতো না, আমরা দু'জন দু'জনের এতো গভীরে পৌঁছে গেছি।

রিকশার ভাড়া দিই। তুমি চুপচাপ দেখলে। শাড়িতে তোমাকে খুব মানায়। বুকের ভেতর চিন্ চিন্ করে। হয়তো তুমি পরস্ত্রী ভেবে। রিনু, তুমি আরো সুন্দর হয়েছো। তোমার কপালে দোল খাওয়া চুলের রিংগুলো এখনো যেন আয় আয় বলে ডাকে।

ডোরবেল বাজলো। দরজা খুলেই তিন বছরের ফুটফুটে মিষ্টি মেয়ে 'মামণি' বলে তোমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তোমার মেয়েটি সুন্দর। কেমন আদর-আদর, ভাবি মেয়েটি আমারও হতে পারতো।

যা হোক মেয়েকে শান্ত করে তুমি ব্যস্ত হলে। বরাবর যা করতে। আগে চা তারপর এসে বসা। আজও তাই। ব্যালকনিতে তোমার প্রিয় ক্যাকটাস। গোলাপও আছে। তবে ক্যাকটাসই তোমার প্রিয়। চা নিয়ে এলে। আবার মুখোমুখি দু'জন। কতো বছর বলো তো? আট। খুব বেশি সময় নয়।

তোমার স্বামী অ্যাডভোকেট। শুনেছি বেশ নামধাম আছে। শহরে জায়াগাও কিনেছ। হয়তো বাড়িও করবে। আর এ শহর ছেড়ে একদিন আমাকে পালাতে হয়েছিল। প্রাণের ভয়ে। তোমার ভাইয়ের হুমকি। অবশ্য বড় ভাই ভাবি রাজি ছিলেন। ভাবি তোমাকে কাজী অফিসেও যেতে বলেছিলেন। তুমি রাজি হওনি। আমার ছোট্ট রুমেও এসেছ একদিন। সঙ্গে ছিলো তোমার পাঁচ বছরের ভাইপো। এতো গভীর ভালোবাসা। সুযোগও ছিল আমাকে পাবার। তুমি নাওনি। অবশ্য কারণ পরে জেনেছি। তখনো আমার মাস্টার্স কমপ্লিট হয়নি। বাবা-মা-ভাই-বোন নিয়ে আমাদের পরিবার প্রতিনিয়ত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে

চলছে। আমাকে ওই মুহূর্তে বিয়ে করলে, আমি নাকি গার্মেন্টস কেরানি হতাম। তাই ভালোবাসার টুটি চিপে ধরে তুমি অন্য ঘরে চলে গেলে। এতে অবশ্য সবাই খুশিও হয়েছে।

ভেবেছিলাম তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না। অথচ দিব্যি বেঁচে আছি। আসলে জানো কী?

জীবন বহতা নদী। সবকিছুতে বাঁধ দেয়া যায়। এখানে ওসব চলে না। তোমার চোখজোড়া এখন ভেজা ভেজা। তবুও একফালি চাঁদের মতো হাসি তোমার ঠোঁটে ঝুলে আছে। খুব স্বাভাবিকভাবে তুমি স্বামীর মৃত্যু সংবাদ দিলে। আমি এতোক্ষণ বুঝতেই পারিনি, তোমার জীবনের এতো বড় অপূর্ণ ক্ষতি হয়ে গেছে।

'আমি বেশ কিছুদিন ধরে আপনাকে খুঁজছি। তুমি কোনোদিন আমাকে 'তুমি' ডাকোনি। এমনকি নাম ধরেও না। অথচ ফোনে, মুখোমুখি কতোবার অনুনয় করেছি একবার নাম ধরে কিংবা 'তুমি' ডাকার জন্য। পারোনি।

'আমিও বেশিদিন নাই। আমার মেয়েটাকে আপনি রাখবেন। আপনার চেয়ে আর আপন কাউকে খুঁজে পেলাম না। ইতুর স্পর্শে আমি বেঁচে থাকবো।'

তোমার চোখে জল। কান্নার মধ্যেও আবার হাসির রোদ ঝরালে।

'আমাকে আর ইতুকে রাখবেন?'

তোমার চোখে অদ্ভুত এক আশ্রয় প্রার্থনা। বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। ফুটফুটে চাঁদের মতো মেয়েটির বাবা নেই। সন্ত্রাসীরা দিন-দুপুরে খুন করেছে। ভাবতেই কেমন লাগে।

আপনার ওপর আমার কোনো অধিকার নেই। প্রশ্নই আসে না। তারপরেও কোত্থেকে এতো নির্ভরতা আসে বুঝি না। আমার ইতুকে দেখিয়েন। তোমার সজল চোখের মিনতি।

তারপর কয়েকটা দিন। একদিন বলা নাই কওয়া নাই চলে গেলে মৃত্যুর ওপারে। আমার চারদিকে শূন্যতা। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে মনে পড়ে যায় তোমাকে। ইতুকে চোখের জলে বুকের কাছে ধরে রাখি।

**মহি মুহাম্মদ**
**বাড়ি# ২৬, রোড # ০২, ব্লক # বি,**
**চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম**

NESCAFÉ
Instant Coffee

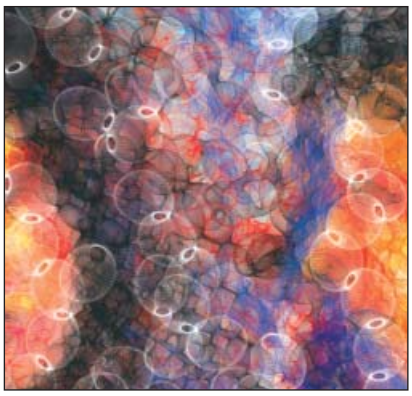

# আমার মা আমার ভালোবাসা

**মোঃ আনোয়ার হোসেন**

মায়ের মুখে শোনা আমার জন্ম অগ্রহায়ণ মাসের ১১ তারিখ, ইংরেজি সাল হিসেবে ধরলে ২৫ নবেম্বর ১৯৮৩। আমার বোনের জন্মের পর আমি ছিলাম আমার মায়ের বহু আকাঙ্ক্ষার ধন। আমার মা আমাদের দুইজনকে ছেড়ে একদিনের জন্য কোথায়ও বেড়াতে যাননি যদি তাঁর পিতৃকুলে/মাতৃকুলে কোনো আত্মীয় ছিল না। ছোটবেলায় মাকে ছাড়া ঘুমাতাম না। আমার যখন ৮/৯ বছর বয়স তখনও আমি মাকে ছাড়া ঘুমাতে পারতাম না। আমার দাদা এই নিয়ে প্রায় সময় মাকে বকতেন যে, ছেলের বয়স আড়াই হলে সে মায়ের সঙ্গে থাকতে পারবে না, গুনাহ হবে। তখন আমার মা আমাকে জড়িয়ে ধরে বলতেন আমি আমার মানিককে ছাড়া কিভাবে থাকবো? মা আমাকে জিজ্ঞেস করতো আমি মরে গেলে তুই কি করবি? আমাকে ছাড়া থাকতে পারবি? আমি বলতাম তুমি মরে গেলে তোমার সঙ্গে আমিও চলে যাবো। তোমার কবরের পাশে আমি শুয়ে থাকবো। আমার কথা শুনে মা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন। আমাদের বাড়ির লোকজনও আমাকে প্রায় সময় দুষ্টামি করে এ কথা জিজ্ঞেস করতো। মাকে ছাড়া একদিনও থাকতে পারবো তা ছিল কল্পনারও বাইরে। আমার মা ছোটকাল থেকে দুঃখী ছিল। ছোটবেলায় মা তার বাবাকে হারায়, না তার জন্মের পূর্বে হারায় তা আমার জানা নেই। কোনো দিন জিজ্ঞেস করিনি মা কষ্ট পাবে বলে। আমার মায়ের বয়স যখন ১০/১১ বছর তখন বিয়ে হয়। আমার মা আমার বাবার কাছে সুখী ছিল না। আমার বোনের জন্মের ২/৩ বছর পর বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেন। বাবা মাকে শারীরিক নির্যাতন করতেন। সামনে যা পেতেন বাবা তা দিয়ে আমার মাকে মারতেন। বাবার অভিযোগ ছিল মা কোনো হিসাব-নিকাশ বোঝেন না। মা কোনো দিন তার কষ্টের কথাগুলো আমাদের বলতেন না, তাঁর দূরসম্পর্কের কোনো আত্মীয়স্বজন এলে তখন কথাগুলো বলতেন।

২০০৩ সালের আগস্ট মাস থেকে আমি আমার বোন, মা তিনজন পর্যাক্রমে আলাদা হতে থাকি। ১১ আগস্ট ০৩ ইং আমার বোনের বিয়ে হয়। বোনকে বিদায় দেওয়ার পর মাগরিবের আজানের সময় আমার প্রচন্ড কষ্ট লাগে আমি চোখের পানি ধরে রাখতে পারি না। বোনকে বিদায় দেবার পর মায়ের অবলম্বন আমি। ১ মেয়ে ২০০৪ইং আমি মা থেকে আলাদা হয়ে যাই, চাকরিতে যোগদান করি। আমি চিন্তা করতাম মা আমাকে ছেড়ে কিভাবে থাকতেন। আমারও কষ্ট হতো কি করবো বাধ্য হয়ে থাকতে হতো। প্রতি সপ্তাহে বাড়িতে চলে যেতাম। আমার মা আমার পথ চেয়ে বসে থাকতেন। মা আমার জন্য শেষ পথ চেয়েছিলেন ১৩ই মার্চ ০৫ইং। গিয়ে দেখি মা বিছানায় বেদনায় ছটফট করছেন। আমাকে দেখে মা সবকিছু ভুলে মুমূর্ষু অবস্থায় আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। ১৮ মার্চ ০৫ইং রাত সাড়ে ১১টায় মা আমার হাতের দেড় চামচ পানি খেয়ে আমার হাতের উপর দিয়ে পরপারে চলে যান। ডাক্তার বলেছিলেন, মায়ের খাদ্যনালী এসিড ব্লক করেছে। ওয়াশি করলে ঠিক হয়ে যাবে। মা পেটের ব্যথায় দুই দিন দুই রাত বিছনায় ছটফট করেছেন, এক মুহূর্তের জন্য মা ঘুমাতে পারেনি, আর কারো ঘুম হয়নি। মায়ের হাত ধরে সারা রাত বসেছিলাম। মা আল্লাহ আল্লাহ করে এদিক ওদিক ছটফট করেন কিছুক্ষণ পরপর আমাকে জিজ্ঞেস করেন 'বাবা আমি ভালো হবো'। মাকে বলতাম মায়ের হাতটাকে নিয়ে কতবার মুখে লাগিয়ে আদর করছি। আমার মনে হচ্ছে মা আমার কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। ভোর রাতে মায়ের চোখে একটু ঘুম আসছিল দেখে আমি পাশের রুমে গিয়ে শুয়ে থাকি। কিছুক্ষণ পর মা বমি করবেন বলে বাইরে নেওয়ার জন্য ইঙ্গিত করছেন। বাইরে নেওয়ার পর মা বমি করেননি। টয়লেটে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলেন। টয়লেট থেকে আনার পর মাকে আবার বিছানায় শুয়ে দেওয়া হয়। কারণ মা পেটের ব্যথার জন্য বসতে পারছে না। সকাল ৭টায় আমি স্থানীয় এক ডাক্তারের কাছে যাই ডাক্তার বললেন, আমার দ্বারা সম্ভব নয়, তুমি তোমার মাকে হাসপাতালে নিয়ে যাও। আমি একটা ট্যাক্সিকে আমাদের বাড়িতে আসতে বলে দ্রুত সাইকেল নিয়ে বাড়িতে ফিরছি। বাড়ির কাছাকাছি আসতে দেখি আমার ছোট ভাই দৌড়ে তাড়াতাড়ি চলেন আম্মার অবস্থা খারাপ কান্নাকাটি করছে সবাই। আমি এসে দেখি মায়ের চারপাশে বসে আমার বোন ও ভাইয়েরা কাঁদছে, ঘরভর্তি লোকজন। সবাই মায়ের মুখে একটু একটু করে পানি দিচ্ছে।

মা কথা বলতে পারছেন না। মায়ের হাত-পা সব নড়াচড়া বন্ধ। মা শুধু নিঃশ্বাস নিতে পারছেন তা বোঝা যাচ্ছে। আমার বোন আমাকে ধরে কাঁদছে। আমি ইয়াছিন সুরা

পড়ছি এবং কিছুক্ষণ পরপর মায়ের মুখে পানি দিচ্ছি। এভাবে ২/৩ ঘন্টা থাকার পর, মায়ের হাত পা নাড়াচড়া করতে দেখে মাকে হাসপাতাল নিয়ে আসি। ডাক্তার বললেন, স্যালাইন দেওয়ার ২/৩ ঘন্টা পর কথা বলতে পারবেন। অধীর আগ্রহে বসে আছি মায়ের সঙ্গে কথা বলার জন্য। ২/৩ ঘন্টার স্থলে ৮/৯ ঘন্টা পার হয়ে যায় মায়ের অবস্থার কোনো উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। ডাক্তার বললেন, আপনারা উনার সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করেন। মায়ের হাতটা নিয়ে বুকে চেপে ধরে আমার মুখের সঙ্গে লাগিয়ে মাকে ধাক্কা দিয়ে কতবার ডেকেছি তার হিসাব নেই। মা চোখ মেলাতে চেষ্টা করেন কিন্তু পারছেন না। দুপুর ১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত এতবার ডাকার পর মা আমার সঙ্গে দুটি কথা বলেছেন- 'কি কি হয়েছে'। মাকে যতবার ধাক্কা দিয়ে ডেকেছি মা ততবার চোখ মেলাতে চেষ্টা করতেন কিন্তু পারতেন না। আমার ধারণা, মাকে ডা. ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন গতকাল এবং গত ২ দিন ২ রাত একটুও ঘুমাননি, তাই মা ঘুমাচ্ছেন। ঘুম ভাঙলে মা কথা বলতে পারবেন। বাবা, ফুফু ও আমার সৎ ভাইয়েরা আমাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেন এবং বলেন তুই বাড়ি থেকে খেয়ে আয়। আমি বাড়িতে এসে ভাত খেয়ে আবার হাসপাতালে আসার পথে বাবা ও ছোট ভাইকে পাই। তারা একজন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছেন। মাকে সকালে ফেনী নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে। বাবা আমাকে বলেন এখন হাসপাতালে যাওয়ার দরকার নেই। সবাই ঐখানে আছে, তোর মন না বুঝলে একবার দেখে আয়। আমি বলি, হাসপাতালে থাকবো। আম্মা ভালো হলে আমাকে খুঁজবে, আমার সঙ্গে কথা বলবে। আমি যাওয়ার পর দেখি মা খুব দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলছে। আমার মনে হয়েছে মা আমার কাছে পানি চেয়েছেন ছোট্ট একটা শব্দ আমি শুনতে পেয়েছি পানি। আমি সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মুখে পানি দিই প্রথম বার মা সুস্থ মানুষের মতো কুলি করেন, দ্বিতীয়বার মা পানি পান করেন। মায়ের একটা হাত আমার হাতে ধরা অবস্থায় মা পরপারে চলে যান। আমার সব ভালোবাসা আমার মায়ের জন্য, মা তোমার কাছে আসতে খুবই ইচ্ছে করছে মা।

**জুনিয়ার নির্বাহী (মাননিয়ন্ত্রণ)**
**পাহাড়তলী টেক্সটাইল মিলস, চট্টগ্রাম**

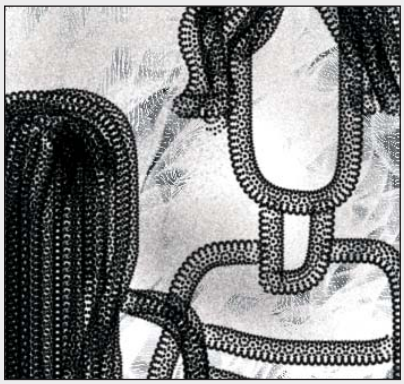

# বালিকার প্রেম

**চঞ্চল শাহরিয়ার**

সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুলের নবম শ্রেণীর তমা এখন সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী। প্রচুর কথা বলা মেয়েটার স্বভাবে কোনো পরিবর্তন হয়নি। সেই একরোখা, জেদী, দুম করে অভিমানে ভেঙে পড়ে কেঁদে দেয়।

আমি বেশি কথা বলা পছন্দ করিনে। ও হড়বড় করে কথা বলে। আমার প্রতিটা কথার কেউ উত্তর দিলে মেজাজ খারাপ হয়। ও প্রতিটা কথার বেশি বেশি উত্তর দেয়।

বিনা নোটিশে দুদ্দাড় করে অফিসে এসে হাজির হয়। কাজ ভন্ডুল করে আমাকে নিয়ে উধাও। কখনো আশুলিয়ার ফ্যান্টাসি কিংডম, কখনো নন্দন পার্ক, কখনো সোনারগাঁ লোকশিল্প যাদুঘরে, কখনো জয়দেবপুর রাজবাড়ী।

যেতে রাজি না হলে কান্নাকাটি। যেতে রাজি না হলে আত্মহত্যার হুমকি। প্রতিদিন একই ঘ্যানর ঘ্যানর ভালো লাগে না বলে একবার তমাকে বলেছিলাম। যা আত্মহত্যা কর, আমি বাঁচি। বাসায় ফিরে হারপিক খেয়েছিল। ব্যাপারটা ক্লিনিক পর্যন্ত গড়িয়েছিল।

তমার উদ্ভট সব কান্ডকারখানা বিষয়ে ওর ছোট খালা অবগত আছেন। তমার ছোটখালা একবার আমাকে বাসায় ডেকে নিয়ে বলেছিলেন- বাবা, আমাদের মেয়েটা হয়তো তোমাকে খুব জ্বালাতন করে। তুমি একটু সহ্য করো।

আমি মাথা চুলকিয়ে বলি, কিন্তু খালাম্মা...। ছোটখালা আমার কথায় বাধা দিয়ে বলেন, বাপ-মা মরা মেয়ে। তাছাড়া ওর জীবনে তুমি প্রথম পুরুষ। তোমাকে নিয়ে তাই ওর এতো উৎসব, এতো আয়োজন। বড় হচ্ছে, একদিন সব বুঝিয়ে বলো, দেখো ঠিক হয়ে যাবে।

তমাকে এ কথা বলতেই ও কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে থাকে। তারপর বলে, অসম্ভব। অয়ন ভাইয়া আপনাকে ছাড়া আমি থাকতেই পারবো না।

- ও কি অসভ্যের মতো কথা'

- দ্যাটস রাইট। আসলে আপনার মতো গুড ইন্টিমেন্সি আমার আর কারো সঙ্গে হয়নি তো তাই...।

হাজারটা মিথ্যে কথা বললেও এই একটা সত্যি কথা বলে ফেলেছে তমা। ওর সঙ্গে কারোরই বেশি দিন সম্পর্ক থাকে না। এইটুকু জীবনে বহুবার বন্ধু-বান্ধবী চেইঞ্জ করলো সাদিয়া, রাখী, তুলির মতো বান্ধবীদের স্যাক করে দিলো। তমাকে এড়ানোর জন্য এ যাবৎ অনেক প্রকল্প হাতে নিয়েছি। কাজ হয়নি। ওকে বলেছি, আমি নেশা করি। প্রচুর মেয়েদের সঙ্গে মিশি, জুয়া খেলি ইত্যাদি ইত্যাদি। ও আমার কোনো কথায় পাত্তা দেয়নি। উপরন্তু ঈদ, পহেলা বৈশাখ, জন্মদিন, ভ্যালেনটাইন ডে, থার্টি ফার্স্ট নাইটে তমা আমাকে ওর দখলে রেখেছে।

দিনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ও আমার বাসা বা অফিসে এসে চমকে দিয়েছে। নিত্য হাসিখুশি তমাকে দেখতে দেখতে আমিও কেমন এনগেজড্ হয়ে গেছি। তমাকে ছাড়া সব কেমন খালি খালি লাগে। ওর মোবাইল না পেলে, ওর সঙ্গে দেখা না হলে মনে হয় কি একটা কাজ যেন বাকি রয়ে গেছে।

তমাকে আমি মোটামুটি পছন্দ করি। এই দুর্দান্ত সত্যি কথাটা কখনো ওকে বলা যাবে না। বললে ও বাজিমাৎ করে দেবে। আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরাবে। অথবা ষোলকলার এক কলা দেখাবে। কারণ ইতিপূর্বে ওর প্রেমিক হিসেবে একাধিকবার পরীক্ষা দিয়ে আমি ফেল করেছি। ক্রমাগত ডেটিং মিস করেছি। জন্মদিনে রাত করে ওদের বাসায় হাজির হয়েছি। তমার গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ শেষ করতে আমার মাস কাবার হয়ে গেছে। মোট কথা, প্রেমিক হিসেবে যা যা করা দরকার, ওর জন্য যতোটুকু টান থাকা দরকার তার কোনোটাই আমার দ্বারা হয়নি।

রাগ করে তমা একবার বলেছিল আমি অস্ট্রেলিয়া চলে যাবো।

আমি হেসে বলেছিলাম, এ আর নতুন কী।

বেইলি রোডে ফাস্টফুডের দোকানে অর্ডার দেয়া খাবার রেখে সেদিন তমা বান্ধবীর বাসায় চলে গিয়েছিল। রাতে বাসায়ও ফেরেনি। রাতে বাসায় ফেরেনি শুনে আমি কোনো টেনশনও করিনি। সেই প্রথম কয়েক দিন ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কে গ্যাপ গেছে।

দশ দিনের মাথায় দেখা হলে অফিস রুমেই তমা আমার কাঁধে মাথা রেখে হু হু করে কেঁদে দিয়েছিল। শুধু একবার ছোট্ট করে বলেছিল, আমাকে কেউ বুঝতে চায় না। ওর এই মায়াবী কণ্ঠস্বর, অতি আপন করে বলা এই কথাগুলো শুনে যে কারোর মন গলে যাবে। আমার গলেনি। কারণ এগারো দিনের মাথায় যে তমা সেই তমাই।

তমা আমার মেঘ না বৃষ্টি, শীতের রোদ না কুয়াশা-এর উত্তর খুঁজে পেতে সময় গড়ালো অনেক।

সিঁড়িতে তমার পায়ের শব্দ। নূপুরের রিনিঝিনি সুর। আমি এই মুহূর্তে মহাব্যস্ত। এটা তমাকে বোঝাতে হলে খুব দ্রুত কম্পিউটারে গিয়ে বসতে হবে। কিন্তু কম্পিউটার যে সকাল থেকে অন করাই হয়নি।

**ট্রেড কনসান ৩য় তলা**
**১৩২ নিউ বেইলি রোড**
**ঢাকা-১০০০**

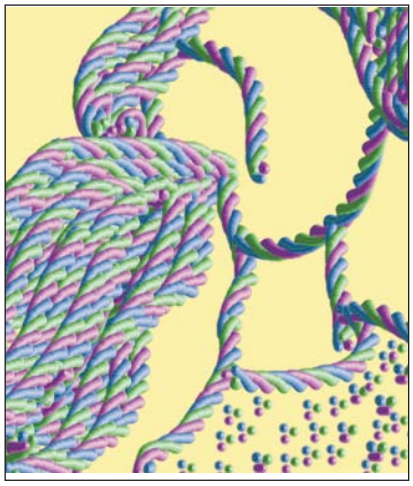

# থুথু

**আসিফুর রহমান**

সন্ধ্যা হতেই শুরু হয় সেই পুরনো গল্প। হলদে বাতিটা জ্বেলে দিয়ে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায় সোমা। সস্তা প্রসাধনের আড়ালে ঢাকে বছরের পর বছর হাজারটা অবহেলার দাগ কেটে যাওয়া মুখ। চকচকে চুড়ি পরে, তেল দেওয়া চুলে রঙিন ফিতা বেঁধে আড়াল করে নেয় প্রায় সাদাকালো হতে চলা মনটাকে। তারপর ঘরের ছিটকিনিবিহীন দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে অন্ধকারের কাছে বন্দি হতে থাকা শহরের কোনো গলিতে। চায়ের দোকানের ছেলেটার দ্রুত হাতে কাপের ভেতর নাড়তে থাকা চামচের শব্দ, হিন্দি গানের চটুল কোনো লাইন, সমাজ বদলের দেয়াল লিখন- এসব কিছুকে পাশ কাটিয়ে এরপর রাজপথে এসে দাঁড়ায় সোমা। ততক্ষণে প্রিয় শহরে নেমে আসা অন্ধকার আড়াল করার চেষ্টায় ঘরে ঘরে জ্বলতে শুরু করেছে বিজলি-বাতি, অন্ধকারের চাদর টেনে দিতে প্রকৃতিও তৈরি হয় পুরনো সেই গল্পের জন্য।

বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে সোমা। আড্ডাবাজ ছেলেরা দলবেঁধে বাড়ি ফিরে যায় একসময়। চা বিক্রেতাদের আনাগোনা যায় কমে। পাশেই পার্ক। গাছের এক কোনায় ঘোরলাগা চোখে বসা দুই যুবক। কোনো কিছুতেই তাদের আনন্দ নেই। নেই রাগ, ভয় বা বিস্ময়, মাঝে মাঝেই সোমার ইচ্ছে করে ওদের মতো হতে। তাও ভালো।

পরিচিত রিকশাওয়ালারা পাশ দিয়ে যায়। ফিরে তাকাতে চোখের চাহনিতেই বুঝে নেয় ওরা- সোমার এখনও রিকশার প্রয়োজন নেই আজ। ঠায় দাঁড়িয়ে সোমা দেখে ফিরে না তাকানো শহরকে।

এক যুবক পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ায় সোমা বুঝে নেয়, আজ সেই পুরনো নিয়মেই এগুতে হবে তাকে। সে ডাক দেয়-

'এই যে, রাত কত হইলো?'

নারীকণ্ঠ উপেক্ষা করে এমন যুবকও আছে? যুবক ফিরে তাকায়, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝে নেয় প্রশ্নকারিণীর পরিচয়। ঝাঁঝালো কণ্ঠে সে উত্তর দেয়-

'লাগবো না, যা ভাগ।'

মনে মনে ওর মুখে থুথু ছিটায় সোমা। ফুটপাতে স্যান্ডেল দিয়ে নকশা কাটে।

যুবক হেঁটে যায় তার পথে। সোমার গল্প এগোয় না।

রাত বাড়ে। জিন্সের পকেটে হাত গুজে ঠোঁটে সিগারেট নিয়ে এসে দাঁড়ায় জামশেদ। চালচলন, হাবভাবে সে ফিল্মি নায়ক। গেঞ্জির সামনে-পেছনে আঁকা পরিচিত কুস্তিগিরের ভ্রূ কুঁচকানো চেহারা। জামশেদ এই লাইনে 'নম্বর' দেয়। এটা তার 'এলাকা'।

'কি রে, কই আছিলি এই কয়দিন?' জামশেদের প্রশ্ন।

'অসুস্থ আছিলাম জামশেদ ভাই।'

'নাকি আবার কোনো মুজরায় গেছিলি?' কায়দা করে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে চুলের মাঝে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করে জামশেদ।

আল্লার কসম জামশেদ ভাই। আপনে মা-বাপ।' এবার ভয় পায় সোমা।

'দেহিছ। নিজের গলা নিজেই বুজিছ। আর নাইলে মামুরা তো আছেই। আমার আর কী দরকার? দূরে দাঁড়ানো টহল পুলিশের দিকে ইশারা করে জামশেদ।

'বিশ্বাস যান জামশেদ ভাই, অসুস্থ আছিলাম'- সোমা ঠোঁট ফোলায়, 'আপনে ছাড়া আর কে আছে আমগোর?'

'হুমম', গম্ভীর জামশেদ পা বাড়ায় পার্কের দিকে। আবার থুথু ফেলে সোমা।

রাস্তার আরও কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায় সোমা। পরপর দুটো গাড়ি হুসহাস ছুটে যায়। দ্বিতীয়টার বেতর উঠতি বয়সের ছেলেরা। একটু দূরে গাড়ি থামায়; তারপর কী ভেবে পিছিয়ে এসে সদ্য পরিপক্ব হয়ে উঠতে শুরু করা কণ্ঠে গাড়ির ভেতর থেকে ডাক দেয়-

'ওই যাবি?'

সঙ্গে সঙ্গে হাসির হুল্লোড় ওঠে গাড়ির ভেতর।

'নাইম্মা আয় কুত্তারা, তগোরে চাপকায়া

NESCAFÉ
Instant Coffee

দেহাই কই যামু।'

হাত উঁচিয়ে বলে সোমা।

ভয় পেয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে ছেলেরা। দুধ, ডিম খাওয়া মস্তিষ্ক এখনও ওদের শেখায়নি ঘরের বাইরে কীভাবে বাহাদুরি করতে হয়। গানের ভলিউম বাড়িয়ে দিয়ে মুহূর্তে উধাও হয় গাড়ি, সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে রাস্তার ঘুমন্ত ধুলোর ওপর থুথু ছিটায় সোমা।

রাত বাড়ে।

কাকে অভিশাপ দেয় সোমা নিজেই জানে না। এক সময় পাশে এসে দাঁড়ায় মুখ চেনা এক ট্রাক শ্রমিক।

'রাত কত হইলো?' সোমার প্রশ্ন,

উত্তরের ধারেকাছেও যায় না লোকটা। অভ্যস্ত ভঙ্গিতে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়-

'লগে গাড়ি আছে?'

'আছে না আবার? একটু খারান'।

সোমা পার্কের বেঞ্চিতে অপেক্ষমাণ এক রিকশাওয়ালকে ইশারা করে। তারও বোধ হয় আজ তেমন পসার হয়নি। তড়িঘড়ি সে পার্কের অন্য প্রান্তের গেট দিয়ে অদৃশ্য হয়। খানিক পরেই রিকশা নিয়ে তাদের সামনে এসে দাঁড়ায় রিকশাওয়ালা। টুনটুন ঘন্টা বাজায় দুবার।

লোকটা রিকশায় ওঠার পরও দাঁড়িয়ে থাকে সোমা।

'কি রে উডছ না?' বিরক্ত কণ্ঠ ভেসে আসে রিকশা থেকে। ঠোঁট ফুলিয়ে মুখে কপট অভিমানের হাসি টেনে নিয়ে লোকটার দিকে তাকায় সোমা।

একবার থুথু ফেলে রাস্তায়

তারপর রিকশায় উঠে বসে।

শেষ রাতের দিকে রিকশা সোমাকে ঘুমন্ত গলির মুখে নামিয়ে দেয়। পরিচিত ধুলোর ওপর দিয়ে হেঁটে এসে ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে সোমা। চুড়ি, ফিতা খুলে রেখে, সব রঙ ধুয়েমুছে সাদাকালো হয়ে বিছানায় এসে শোয়। অসারতার কাছে পরাস্ত হতে থাকা চোখ বুজে আসার ঠিক আগে সোমা টের পায় জেগে উঠছে শহর। মিটিং-মিছিল আর নারীমুক্তির স্লোগানে মুখরিত হবার জন্য শহর একে একে জাগায় তার প্রিয় সন্তানদের। মুখ ধুয়ে ধুয়ে পবিত্র হয়ে শহরের সন্তানেরা বেরিয়ে আসে পথে। আত্মা ধোয়া যায় না বলে সে চেষ্টাও তারা করে না। শহরের প্রিয় সন্তানদের আত্মার দেয়ালে লেগে থাকে লাখ লাখ সোমাদের থুথুর দাগ।

* ভালোবাসা কী সোমারা জানে না। সোমারা বেঁচে থাকে, জীবন জীবিকার প্রয়োজনে।

**পলাশ-২**
**আজিমপুর জজ কোয়ার্টার**
**আজিমপুর**

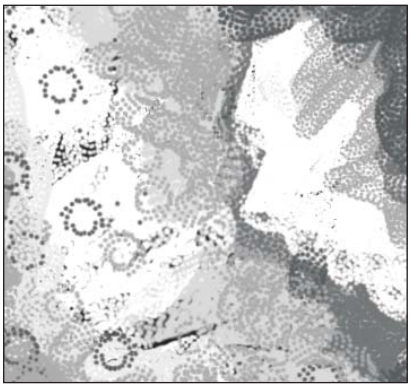

# অঞ্জনার জন্য ভালোবাসা

**নেসার শহীদ**

অঞ্জনার নাম স্মরণে আমাদের হৃদয়ে প্রেমের অঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের আমরা সাত বন্ধুর একমাত্র বান্ধবী অঞ্জনা। আহলাদ আর আহলাদে ভরপুর যেকোনো চাওয়াই তার অপূর্ণ থাকে না। কেউ না কেউ দাঁড়িয়ে যায় ঠিকই, অঞ্জনা চেয়েছে বলেই সেটা অনিবার্য। ভাবখানা এমন, 'প্রাণটা চাওনি তো দেবী, তাও দিয়ে দেব অনায়াসে।' অঞ্জনা বন্দনায় কেমন করে কেটে গেছে অনার্স লাইফ বুঝতেই পারিনি।

ঘুরে দেখেছি খুব কমই, অল্পজ্ঞানে তাই আমাদের সিলেট এমসি কলেজ ক্যাম্পাসকে অদ্বিতীয়ই ভাবি। এমনি মনোরম শান্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা ক্যাম্পাস বোধ হয় আর একটাও নেই। এমসির ক্যাম্পাসের পরতে পরতে মিশে আছে অঞ্জনার স্মৃতি। দর্শন বিভাগের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে অঞ্জনার রোপণ করা দেরিতে বাড়তে থাকা সেই বিখ্যাত কদম গাছ, যেটা নিয়ে অঞ্জনার দাবি ছিল, 'আমার সেই কদম গাছে একদিন অবশ্যই ফুল ফুটবে!' তাছাড়া আজ শহীদমিনারে তো কাল ক্যান্টিনে, পরশু পুকুর ঘাটে, কখনো অডিটোরিয়াম হলের পেছনে, কখনে বাংলার সাহিত্য আড্ডায়, কখনো দর্শনের সেমিনারে, কখনো গণিতের সিঁড়িতে, কখনো প্রিন্সিপালের টিলায়, কখনো কেমিস্ট্রির পেছনে, কখনো সোসিওলজির বারান্দায় কোথায় বসেনি আমাদের আড্ডা!

অঞ্জনা আমাদেরকে বন্ধুত্বের সংজ্ঞা শেখাতো। কবে কোন দিবস পালিত হচ্ছে, কবে কার জন্মদিন- আমাদের নিজেদের জানার আগে ওই আমাদরে শুভেচ্ছা ও উপহারের সঙ্গে সারপ্রাইজড করতো। বন্ধুত্ব নিয়ে ও এমনি পাগল ছিল। ও ভাবতো স্বামীর ঘরে গিয়ে আমাদের টানে টিকতে পারবে না। অঞ্জনা আমাদের রাজি করিয়েছে, ও যদি তার স্বামীর ঘর থেকে চলে আসে তবে তাকে আশ্রয় দিতে হবে। একদিন কেমিস্ট্রির পেছনের টিলার ওপর সবার হাত একত্রিত করে শপথ করালো- 'আমাদের বন্ধুত্বের এই বন্ধন ইহজনমে কোনো দিন ভাঙবে না।' ও বলতো, বন্ধুত্ব ঠিক থাকে বিশ্বাসের ওপর। আমরা যেন পরস্পরের প্রতি কখনো বিশ্বাস না হারাই।

অঞ্জনা রাজি থাকলে পৌরাণিক পঞ্চপান্ডবের দ্রৌপদী রূপে কলিকালে হয়তো আমরা নতুন উদাহরণ তৈরি করতে পারতাম। রিন্টু, বাবলু, হেমন্ত, লেলিন, আমিন, শমী আর আমি আমাদের সাত বন্ধুর একমাত্র অঞ্জনা। অঞ্জনারও অন্য কোনো বন্ধু বা বান্ধবী ছিল না। ওকে নিয়েই এমন জমে ছিল যে অন্য বন্ধু বা বান্ধবীদের দিকে আর তাকাবার অবসর ছিলো না।

কীভাবে আমরা এই আটজন মিলিত হয়েছিলাম এখন ঠিক মনে নেই। তৃতীয় বর্ষে পড়াকালীন আবিষ্কৃত হলো একে অন্যের প্রতি এই সম্পৃক্ততা। কেউ আমরা কারো কাছ থেকে দূরে থাকতে পারতাম না। অন্য কোনো সার্কেলের প্রতি আমাদের কারোরই তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিলো না। আর কেউই আমরা প্রেমে পড়িনি এটা প্রায় আশ্চর্যই। যেখানে ইয়ারমেট বা ডিপার্টমেন্টের অন্য বন্ধু-বান্ধবীরা ধুমধাম প্রেমে পড়ছিলো, সেখানে বাকি থেকে গেলাম শুধু আমরা। তবে কি আমরা সবাই অঞ্জনার প্রেমে পড়েছিলাম? সেটাও হতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে ওর জন্য আমার হৃদয়ে একটু ধুকপুকুনি ছিলোই। তবে সচেতনভাবে আমরা সবাই ষড়যন্ত্র করেছিলাম অঞ্জনাকে হেমন্তের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে। বিয়ের পরও অঞ্জনা যাতে আমাদের দখলে থাকে এটাই ছিল ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য। অঞ্জনা বলতো, আমাদের ছাড়া লাইফটা সে কল্পনাও করতে পারে না। হেমন্তের ঘাড়ে চাপালে এই কষ্টটা অন্তত থাকতো না তার। তাছাড়া এজন্য ওদের দুজনের আচরণকেও দায়ী করা যায়।

অঞ্জনা হেমন্তকে একটু বেশিই গুরুত্ব দিত। আর হেমন্তকেও দেখতাম শালা অঞ্জনার কথায় সহজেই গলে যেত। আমাদের ষড়যন্ত্র সফল হয়নি অঞ্জনার (হয়তো) অধিক উচ্চাভিলাষের কারণে। অঞ্জনা স্পষ্টই বলে দিলো- তোরা আমার বন্ধু, বন্ধুই থাকবি, অন্য কিছু চিন্তা করবি না।

অঞ্জনা আহামরি সুন্দরী ছিলো না। রান্নাবান্নার জ্ঞান ওর চেয়ে আমারই বেশি ছিল। আমাদের মেসে এলে আলুভর্তা বানিয়ে কত খাইয়েছি ওকে। ওর গানের গলা ভালো চিল। তবে কখনই শিল্পী হবার বাসনা ছিল না। এমনকি অনেক বলেও কলেজের কোনো ফ্যাংশনে ওকে গাওয়াতে পারিনি। ওর গান ছিল শুধু আমাদের জন্য। দর্শনের ছাত্রী হয়েও সাহিত্য জানতো ভালো। তবে ধরা পড়তো মাঝেমধ্যে। একবার বাজি ধরে বই জিতেছিলাম ওর কাছ থেকে। লেখাপাড়ায় ভালো ছিল যতটুকু, তারচেয়ে বেশি মনযোগী ছিল। তবে এ কথা মেনে নিতেই হবে। ওর ছিল অসাধারণ সম্মোহনী, যা দ্বারা সে আমাদের ধরে রেখেছিল পুরো অনার্স মাস্টার্স লাইফে।

অঞ্জনা আমাদের শপথ করিয়েছিলো, আমরা কেউ প্রেমে পড়লে কাউকে গোপন করতে পারবো না। আমাদের কারো প্রেম হয়নি। কথা ছিল আমাদের পছন্দ ছাড়া ও কাউকে পছন্দ করতে পারবে না। কিন্তু ও আমাদের অজান্তে সুপনের প্রেমে পড়ে ঠকা খেয়েছে। ও বলেছিল, বন্ধুত্ব টিকে থাকে বিশ্বাসের ওপর। কিন্তু ও আমাদের বিশ্বাস করতে পারেনি। পিকনিকে ও-ই ইচ্ছে করে ঘনিষ্ঠ হয়ে কিছু ছবি তুলেছিল। পরবর্তীতে ছবিগুলো নিয়ে নেগেটিভ নষ্ট করেছে। ভেবেছে এগুলো দিয়ে আমরা তার দুর্বলতার সুযোগ নেব। ও বলেছে, তার বিয়ের পর যেন আমরা তাকে ভুলে না যাই, তার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ না করি। কিন্তু এইতো মাত্র বছর খানেক হলো লেখাপড়া শেষে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়েছি। সে চিঠি লিখেছে তার সঙ্গে যেন আমরা কোনোরূপ যোগাযোগ না রাখি। তার ফ্যামিলি মনে করে, আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক তার জন্য বর পেতে সমস্যার সৃষ্টি করবে। কিন্তু আমরা জানতাম তার ফ্যামিলি আমাদের ভালো ছেলে বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই স্বীকৃতির ফলশ্রুতিতেই তো অনার্স ফাইনাল শেষে তাদের বাড়িতে সবাই বেড়িয়ে এসেছি!

অঞ্জনা আমাদের বন্ধুত্ব শিখিয়েছে, এখন নিজেই সেই বন্ধুত্ব ভুলে গেছে। ও বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কিন্তু সে তার সব প্রতিশ্রুতি ভেঙে দিয়েছে। অঞ্জনা আমাদের ভালোবেসেছে। ভালোবেসে দেউলিয়া করে এখন পথে ছেড়ে দিয়েছে। কেননা, ভালোবাসার মূল্য শোধ করার যোগ্যতা সে হারিয়ে ফেলেছে।

আমাদের সমাজে এখনো ছেলে-মেয়েতে বন্ধুত্ব মেনে নেয়া হয় না। আমরা ভেবেছিলাম, অঞ্জনার হাত ধরে এই সংস্কার আমরা ভেঙে দিয়েছি। মূলত অঞ্জনাই নেতৃত্ব দিয়েছে তাতে। আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম তার সাহসিকতায়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে অঞ্জনা নিজেই ভেঙে পড়েছে তার পরিবার ও সমাজের চাপের কাছে। আমরা জানতাম সামাজিক চাপের মুখে মেয়েরা কতটা অসহায় আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু অঞ্জনার মতো শিক্ষিত মেয়েরাই যদি এভাবে আত্মসমর্পণ করে, তবে এসব দেয়াল ভাঙবে কারা?

সাধারণভাবে সমাজ মেয়েদের যেভাবে মূল্যায়ন করে- অবলা, রহস্যময়ী, ছলনাময়ী, লোভী, স্বার্থপর পাত্র অনুসারে তাদের রঙ পরিবর্তন করার অভ্যাস, সবই তো মেয়েদের বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান। এই সাধারণ জ্ঞানও আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে নেই। কিন্তু যে অঞ্জনা আমাদের সাত সাতটি যুবককে চারটি বছর ধরে মোহমুগ্ধ করে রাখলো, সে কেন একটু সাহসী হবে না? একটু ব্যতিক্রম হবে না?

অঞ্জনার এই পরাজয় আমাদের পীড়া দেয় ভীষণ। তারপরও তাকে ঘৃণা করতে পারি না পারি না অন্যদের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলতে। যে ছিল মধ্যমণি, জীবনের সব সোনালি দিনে তাকে ঘৃণা করি কী করে? অঞ্জনার জন্য ভালোবাসা।

mvwnK 2000 eivei Avdbvi wWKvbv cvVvevi Rb¨ Abyiva Kiv njv|

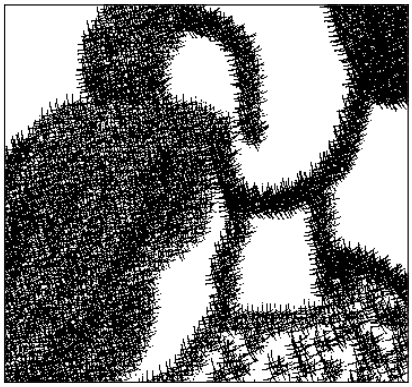

# বনলতা সেন

## রওশন আরা বেগম নিপু

সকালের নরম রোদ যখন স্পর্শ করলো নদীয়ার বেডরুমের হালকা নীল পর্দাটা নদীয়া তখন স্বপ্নে দেখছে তার স্বপ্নের রাজকুমারকে। আসছে রাজকুমার... তার সাদা ঘোড়ায় চেপে... হঠাৎ... হারিয়ে গেল রাজকুমার। চোখ মেললো নদীয়া। কপালে একরাশ ভাঁজ আর মনে অজস্র বিরক্তি নিয়ে তাকালো মোবাইলটার দিকে। মেসেজ আসার খবর সগর্জনে প্রকাশ করছে মোবাইলটা।

মেসেজ খুলল নদীয়া। মেসেজটা পড়ে নদীয়ার ঠোঁটের কোণে দেখা গেল একটুকরো মিষ্টি হাসি। বিরক্তি উধাও। বিড়বিড় করে বললো- কে তুমি?

দরজায় নক হলো- নদীয়া ক্লাসে যাবি নাকি। জলদি উঠ।

আসছি মা। তড়িঘড়ি বাথরুমে ঢুকলো নদীয়া। ভাবছে, কে রোজ সকালে এতো সুন্দর সুন্দর মেসেজ পাঠায়? কে?

নদীয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। ওরা সাত বন্ধু। অরিত্র, আরিয়ান, সুনীল, নদীয়া, মিথিলা, মৃত্তিকা ও সুপ্রভা।

সারাক্ষণ প্রচন্ড বাক বিতন্ডায় কেটে যায় ওদের আড্ডার মুহূর্তেগুলো। নদীয়া ভালো গান গায়, ছবি আঁকে, তবে ওর মতে সবচেয়ে ভালো পারে অরিত্রর সঙ্গে ঝগড়া করতে। অরিত্রর কাজই হচ্ছে নদীয়াকে রাগানো। নদীয়ার গায়ের রঙ শ্যামলা বলে ওকে ডাকে কালী। অবশ্য নদীয়াও এই তিন বছরে শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এখন আর এজন্য রাগ করে না।

ক্লাস শেষ হতেই সাতজনকে দেখা গেল ভার্সিটির করিডরে দাঁড়িয়ে গল্প করতে। যথারীতি অরিত্র ক্ষেপাচ্ছে নদীয়াকে-

- কিরে কালী তোর খবর- টবর কি?

- কয়টার খবর শুনতে চাচ্ছিস পরিষ্কার করে বললে খবর পরিবেশনে সুবিধা হতো। বলল নদীয়া কিছুটা রাগতস্বরে।

তারপরই হাসিমুখে বলল-

- জানিস কদিন ধরে একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে। রোজ সকালে কে যেন আমাকে মেসেজ পাঠায়। কি যে সুন্দর কথাগুলো। তোদের কি বলবো।

- তাই নাকি? কালীকেও মেসেজ পাঠায়? লেগে থাক, লেগে থাক। বলা তো যায় না কোন ধলা মিয়া মেসেজের কোম্পানি খুলে বসেছে আর তার প্রিয় কালীর কাছে মেসেজ পাঠাচ্ছে।

- সবাই হেসে উঠলো অরিত্রর বলার ঢঙে। এমনকি নদীয়াও হেসে উঠলো।

সুপ্রভা হাসি থামিয়ে বললো- দেখ অরিত্র তুই সবসময় নদীয়ার সঙ্গে লেগে থাকিস কেন?

- আমি? আমি লেগে থাকি? এই দেখ, এক... দুই... তিন... চার। দেখেছিস, ঠিক চার হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছি। তারপরও বলবি লেগে থাকি? তোর চোখে কোনো সমস্যা নেইতো রে সুপ্রভা?

- আবারও হাসির বন্যা ওঠে।

- যাই হোক আমার ইচ্ছা যে মেসেজ পাঠায় তার সঙ্গে কথা বলার। কিন্তু আশ্চর্য কি জানিস সে কোনো ফোন ধরে না। রিং হয় কিন্তু কেটে দেয়।

- কে জানে, কানে শোনে কি না?

ফুট কাটলো অরিত্র।

নদীয়া ওর কথার কান না দিয়ে বললো- দেখি কি করা যায়। না হয় এসএমএস-এ বন্ধুত্ব করবো।

- দেখ যা ভালো মনে করিস- সুনীল বলল। বলেই তাড়া দিল- চল, চল ক্লাসে যাবি না?

পরদিন ভার্সিটিতে, ক্লাস শেষে যথারীতি আড্ডা। আরিয়ান বলল, এই যে বাচ্চারা ১৪ই ফেব্রুয়ারি তো এসে গেল। কি করবা?

- কি আর করবো বুড়া চাচা? খাবো আর ঠ্যাং তুলে নাচবো। অরিত্রর কথায় সবার মধ্যে হাসির রোল ওঠে।

- আহা! অরিত্র, তোর না সবকিছুতেই বেশি বেশি। একটা কথা বলা যায় না অমনি ধরে ফেলবি।

- আহা আমার কি দোষ? তোরাই বলের মতো গোল গোল কথা বলিস তাই আমাকেও ধরতে হয়। জানিসই তো আমি আবার ক্রিকেটের রাজা।

- হয়েছে, আর ঢং করতে হবে না। ১৪ তারিখ কি প্রোগ্রাম তাই বল।

- আমি আমার ইয়ের সঙ্গে দেখা করতে

চট্টগ্রাম যাবো। তাই আমি বাদ- বলে উঠলো অরিত্র।

সবাই বিস্ময়ের সঙ্গে জানতে চাইল-

কার সঙ্গে রে? মেয়েটা কে? নাম কি?

চট্টগ্রামেই থাকে?

- আরে কি মুশকিল। বললে তো সবই নষ্ট হয়ে গেল। একটা ভাব আছে না। পরে বন্ধুরা, পরে। ধীরে বহে মেঘনা।

- থাক থাক বলা লাগবে না। তোর সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি। বলল নদীয়া।

- কালী, Stop your mouth. নয়তো থোতা মুখ ভোতা করে দেবো। তখন কোন ধলা মিয়াই আর বিয়ে করবে না।

- তাতে তোর কি? এ্যাঁই- এলেন আমার চিন্তার দাদা ঠাকুর।

- ওকে, ওকে শান্তি শান্তি, দু'হাত তুলে বলে উঠলো সুনীল। এবার বল কি করবি। আর অরিত্র তুই যখন ঢাকাতেই থাকবি না তখন আমাদের ওপর দয়া কর। এবার ক্ষ্যামা দে বাবা।

- নদীয়া বলল, আমার সেই এসএমএস বন্ধু মেসেজ পাঠিয়েছে ১৪ তারিখ দেখা করবে। তাই আমিও বাদ।

- আরিয়ান বলল, ওকে, তাহলে আমরা অভাজনরাই ঘুরতে যাই। আমাদের তো এসএমএস বন্ধুও নেই। চট্টগ্রামের ইয়েও নেই।

আবার একচোট হাসি।

১৪ ফেব্রুয়ারি

নীল জামদানি, নীল টিপ, নীল চুড়ি আর খোঁপায় নাম না জানা সাদা ফুলে সজ্জিত নদীয়াকে আজ অপূর্ব লাগছে। যদিও এই সকালে যাদুঘরের সামনে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে নদীয়ার চরম বিরক্তি লাগছে। তবুও কৌতূহল আর বিরক্তি, অচেনাকে জানার আনন্দ আর অপেক্ষার কষ্ট নিয়ে অপেক্ষা করছে নদীয়া। কোথায় সে?

এখনও এল না?

- কিরে কালী? তুই এখানে?

- আরে অরিত্র? তোর না চট্টগ্রামে থাকার কথা? নাকি ছ্যাঁকা-ট্যাকা খেলিরে?

- তোর মতো কপাল নিয়ে অরিত্র জন্মায়নি। এই কপাল ছ্যাঁকা খাওয়ার জন্য নয় হে অবোধ বালিকা। যাই হোক, একটা সাজেশান দে তো। আজ কাউকে কিছু উপহার দিতে চাইলে কি দেয়া উচিত?

- ১৪টা লাল গোলাপ কিনে ফেল। ফাটাফাটি হবে। তবে দিবি কাকে?

- তা দিয়ে তোর কি দরকার? ভালো কথা, তুই কি তোর ধলা মিয়ার জন্য অপেক্ষা করছিস?

- হ্যাঁ রে। দেখ না এখনো আসছে না।

- ফোন কর।

- ফোন ধরে নাতো। আচ্ছা দেখি চেষ্টা করে।-

- হ্যাঁ চেষ্টা কর। আমি ফুল কিনে আসছি।

- হ্যালো এসএমএস বন্ধু? কি ব্যাপার,

তুমি আসবে না?

- এসেছি তো বনলতা সেন। তোমার পেছনে।

চমকে ফিরে তাকায় নদীয়া। একরাশ বিস্ময় নিয়ে প্রচন্ড ভালোলাগায় দেখে অরিত্র দাঁড়িয়ে আছে। হাতে ১৪টা লাল গোলাপ। চোখে কি এক দ্যুতি নদীয়া জানে না।

হঠাৎ কি হয়ে গেল! নদীয়া রুদ্ধশ্বাসে বলতে থাকে- তুমি? তুই... এভাবে... আমাকে ...আর বলতে পারে না। কেঁদে ফেলে।

তারপর... রিকশা নিয়ে সোজা বাসায়। পেছনে অরিত্র সমানে চেঁচাচ্ছে- এই কালী, কিরে কি হলো?

বাসায় এসেই কান্নায় ভেঙে পড়ে নদীয়া। ওতো কবে থেকেই ভালোবাসে অরিত্রকে। কিন্তু বলতে সাহস হয়নি। কিন্তু অরিত্রও ভালোবাসে? ... কেন যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।

হঠাৎ চমকে উঠে দেখে বিকেল ৫টা। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে। এদিকে মোবাইলটাও বাজছে সমানে।

- হ্যাঁলো কে?

- নদী, আমি আরিয়ান। তুই তাড়াতাড়ি অরিত্রর বাসায় চলে আয়। ও অ্যাকসিডেন্ট করেছে। কতক্ষণ ধরে মোবাইলে ট্রাই করছি। ছিলি কোথায় রে ফাজিল? জলদি আয়।

- আমি আসছি। মাথায় একরাশ চিন্তা নিয়ে মাকে তাড়াতাড়ি কি বলে যে নদীয়া বের হলো নিজেও জানে না।

অরিত্রর বেডরুম।

ওরা সবাই বসে আছে। অরিত্র বিছানায় শোয়া। মাথায় একটা ব্যান্ডেজ। নদীয়া ঘরে ঢুকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে ওর দিকে। অরিত্রই বলে ওঠে, আয় কালী।

- আরিয়ান, নদীয়ার মাথায় একটা চাটি দিয়ে বলে- তুই কিরে, কেঁদে কেটে মুখের কি অবস্থা করেছিস।

নদীয়ার চোখে আবারও জল আসে অকারণে।

- সুনীল বলল, সরি দোস্ত। কিন্তু কি করব। এই অরিত্র হাবুটা কিছুতেই বুঝতে পারছিল না তোকে কিভাবে প্রপোজ করবে। তাই আমরা বুদ্ধি দিলাম নতুন একটা সিম কিনে তোর সঙ্গে এসএমএস-এ যোগাযোগ করতে। তবে তুইও এতো তাড়াতাড়ি ধরা দিবি তা অবশ্য বুঝিনি। যাই হোক- ঘুঘু যে ফাঁদে ধরা দিয়েছে এটাই আসল।

নদীয়া কিছুই বলতে পারে না। ওর চোখ যেন ঝরনা ধারা। অবিরত অশ্রুমালা ঝরে পড়ছে। অরিত্র নদীয়ার মাথায় হাত দিয়ে বলে-

- কাঁদছ কেন, বনলতা? এই তো আমি। তোমার বন্ধুরাও আছে। অবশ্য তুমি যদি এখনও কোনো ধলা মিয়ার আশায় থাকো তবে ভিন্ন কথা। অবশ্য আমাকেও কেউ কালা মিয়া বলে না।

সবাই হেসে ওঠে।

- আজকের দিনটাকে আর একটু স্মরণীয় করে রাখি- বলেই অরিত্র ওর চমৎকার ভরাট গলায় আবৃত্তি করলো-

'চুল তার কবে কার
অন্ধকার বিদিশার নিশা
... ... ...
নাটোরের বনলতা সেন।'

কানে ভালোবাসা সৃষ্টি করছে অরিত্রর চমৎকার কণ্ঠস্বর। যেই আবৃত্তির জন্যই ওর প্রেমে পড়েছিল নদীয়া সেই ১ম বর্ষ থেকেই। নদীয়ার চোখ মানছে না কোনো বাঁধা। অবিরত অশ্রু ঝরে পড়ছে অরিত্রর জন্য অজস্র ভালোবাসা নিয়ে।

**৩২৬/বি, (৫ম তলা),**
**খিলগাঁও, তালতলা, ঢাকা-১২১৯**

---

# অথৈ জলে বাস

**হিমু আকবর**

আজকের সকালটা অন্যদিনের চেয়ে আলাদা। জানালার বাইরে বসে দুটো চড়ুইয়ের মধ্যে খুনসুটি চলছে। অপেক্ষাকৃত বড় চড়ুইটি ছোটটির শরীরে অনবরত ঠুকরিয়ে যাচ্ছে। ছোটটি সম্ভবত মেয়ে চড়ুই। বেচারী সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত উড়ে গিয়ে টেলিফোনের তারে বসলো।

আমি জানালা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। হাতঘড়িটার দিকে তাকালাম। আটটা একুশ। ঠিক সাড়ে ৯টায় বাসা থেকে বের হতে হবে। দীঘিরপাড়ে ১০টা থেকে ১০টা ৩০ পর্যন্ত তিতির অপেক্ষা করবে। ওর সময়জ্ঞান প্রবল। কোনো দিন দেরি করে আসার রেকর্ড ওর নেই। আমি কিন্তু সবসময়ই দেরি করে যাই। ইচ্ছা করেই।

তিতির ভীষণ রেগে যায়। মাঝে-মধ্যে গালাগালও দেয়। গত সপ্তায় ৩টায় আসতে বলেছিল আমায় সার্কিট হাউসের মোড়ে। আমি সাড়ে ৩টায় ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াই। হাসিমুখে বলি, 'কখন এসেছো?'

তিতির কটমট করে তাকায়, তোমাকে বলতে হবে?'

- বাসা থেকে ঠিক সময়েই বেরিয়েছিলাম। মোড়ের দোকানটা পেরুতেই পতিত হলাম।

তিতির কৌতুহল নিয়ে তাকালো। গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলো, 'কোথায় পতিত হলে?'

- সরাসরি ম্যানহোলে। ঢাকনা ছিল না। কোনো রসিক ব্যক্তি হয়তো বা ঢাকনাটা খুলে নিয়ে গিয়েছিল।

তিতির এবার করুণ চোখে তাকালো। অসহায় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো, কোথাও ব্যথা পেয়েছো?

আমি কাঁদো কাঁদো স্বরে বললাম, 'হ্যাঁ, দিলে বড় চোট লেগেছে!'

- তুমি একটা মিথ্যুক! গাধার গাধা!

- গাধা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা আছে আমার। কিন্তু গাধার গাধাটা কী বলো তো?

তিতির রাগের সঙ্গে বললো 'গাধার বাপ!'

- দেখো, তোমার উপমাটা কিন্তু মোটেই সুন্দর হয়নি। আমি যদি গাধার বাপ হই তাহলে তুমি কিন্তু অবশ্যই গাধার মা হবে।

আমার এমন অদ্ভুত কথা শুনে তিতির হাসি চেপে রাখতে পারলো না। সে খিলখিল করে হেসে উঠলো। আমি আশ্বস্তের নিঃশ্বাস ছাড়লাম। তিতিরের রাগটা কমেছে!

**খ.**

রাস্তায় পা বাড়াতেই সাজ্জাদের সঙ্গে দেখা। অনেক দিন পর ওকে দেখলাম। 'কিরে শালা কই যাস'?

আমার পিঠ চাপড়ে জিজ্ঞাসা করলো সে। ওর স্বভাবই এ রকম। পিঠ চাপড়ানো ছাড়া কথা বলতে পারে না।

আমি হাসিমুখে বললাম, 'দীঘিরপাড়ে যাচ্ছি। কিন্তু তোর এই অবস্থা কেন? কতো দিন শেভ করিসনি, চুলে তো মনে হচ্ছে জট পেকে যাচ্ছে। মারফতি লাইনে নেমে গেলি নাকি?

সে হো হো করে হেসে উঠলো। তারপর ভীষণ করুণ কণ্ঠে বললো, 'বন্ধু! ফেরারি আসামি। ছয় মাস থেকে পুলিশ খুঁজছে।' আমি বিস্ময় চেপে রাখতে পারলাম না, 'কেন?'

- বর্ষাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম তাই।

- বর্ষার অমতে?

- না। সেই কোর্ট ম্যারেজ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল।

- তারপর?

- তার আর পর নেই। যাইরে বন্ধু, ভালো থাকিস।

সাজ্জাদ একটা চলন্ত বাসে উঠে পড়লো। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম। মনটা কেন জানি খারাপ হয়ে গেলো। বর্ষার সঙ্গে সাজ্জাদের সম্পর্ক প্রায় চার বছরের। অথচ সেই ভালোবাসাই কি না...।

আমি বাসার দিকে পা বাড়ালাম। আজ আর দীঘির পাড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না।

**গ.**

রাত জাগা আমার বাজে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। রাত জাগার মাঝে কোনো নেশা আছে কি না জানি না। তবে আমার নেশা হয়। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর সানাই আর নির্ঘুম রাত। দুটোতেই এখন ডুবে থাকি। মাঝে মাঝে গভীর রাতে তিতির ফোন আসে। সে ভীষণ করুণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কেমন আছো?' আমি কোনো কথা বলি না। অথবা বলি তিতির শুনতে পায় না। কিন্তু আমি শুনতে পাই- 'হ্যালো... হ্যালো... প্লিজ মিরো কথা বলো... প্লিজ...!' আমি রিসিভার রাখি। গাল বেয়ে গড়িয়ে আসা একটা নোনতা ধারা ঠোঁটের কাছে এসে থেমে যায়। বাইরে তখন অনেক রাত।

**ঘ.**

হাসপাতাল সম্পর্কে আমার খুব একটা ধারণা নেই। গত বছর অ্যাকসিডেন্ট হওয়ার পর জীবনে প্রথম হাসপাতালে যাই তাও ডেন্টাল। আজ দ্বিতীয়বারের মতো হাসপাতালে ঢুকলাম। ২০৩ নম্বর বেডের পাশে আসতেই সাজ্জাদকে দেখলাম। আমাকে দেখেই ওঠার চেষ্টা করলো সে। পারলো না।

- জানতাম তুই আসবি!
- খুব মেরেছে নারে?

সাজ্জাদ আচমকা হো হো করে হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে ওর চোখে পানি এসে গেলো।

আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। জানি আমার চোখও বিদ্রোহী হয়ে উঠবে।

- আমার ছয় বছরের জেল হয়েছে।
- জানি।
- হাসপাতাল থেকে রিলিজ হওয়ার পরই জেলে পাঠিয়ে দেবে। নারী নির্যাতন মামলা।
- বর্ষা কি তোর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছে?
- জানি না। তুই এখন যা মিরো। তোকে অসহ্য লাগছে। কাউকে সহ্য করতে পারি না। তুই চলে যা।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। সাজ্জাদের হাত ধরলাম। সে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লো। তার চোখের জল সে আমায় দেখাতে চায় না!

**ঙ.**

অনেক বছর পর তিতিরের সঙ্গে দেখা হলো। ওর পরনে বাসন্তী রঙা শাড়ি। পাশে ব্লেজারে ঢাকা চশমার ফ্রেমে বন্দি দোসর। সে হাসিমুখে এগিয়ে এলো,

'কেমন আছে?'

- ভালো।
- কেমন ভালো? তিতিরের কণ্ঠে বিদ্রুপ।
- বেশ ভালো।
- আমার স্বামী। ডা. দীপু।

তিতিরের বর হাত বাড়িয়ে দিলো। আমি হাসিমুখে ওর বরের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলাম। অতঃপর সামনের দিকে পা বাড়ালাম।

তিতির অসহায় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। সে চোখের গহিনে আমার আমিত্ব বাঁধা পড়ে বহু বছর আগে। সেখানে আজ অপার শূন্যতা!

**চ.**

রোজ দুপুরে আমরা দীঘিরপাড়ে গিয়ে বসি। সাজ্জাদ অনর্গল কথা বলে যায়। জেলখানার কথা... কষ্টের কথা... বর্ষার কথা। আমি শুধু শুনি। কিন্তু কিছুই বলতে পারি না। কথাগুলো আর কথা থাকে না। জল হয়ে ঝরে পড়ে। আমি চোখ বুজি। চতুর্দিকে অথৈ জল। সে জলেই আমি আত্মসমর্পণ করি।

**ফেন্ডস লাইব্রেরি, জামে মসজিদ মোড়**
**প্রধান সড়ক, মাইজদী কোর্ট,**
**নোয়াখালী**

---

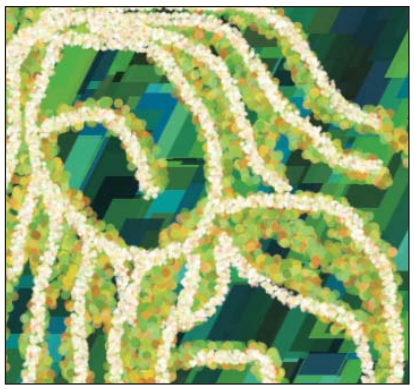

# ভালোবাসার হিসেব-নিকেশ

**দিপু রহমান**

ভালোবাসার মানুষটাকে তুমি কিছু বুঝতে না দিয়ে, সংসারের স্বাদ না দিয়ে ডিভোর্স দিয়ে দিলে? মমতা কথা বলার সময় কোনো রকমে কান্না চেপে রাখলো। সে গত দুরাত এক মুহূর্তের জন্য দুচোখ এক করতে পারেনি। পারেনি তার প্রোগ্রামগুলোতে মনোযোগ দিতে। সারাক্ষণই সে অতীত ভেবেছে, ভেবেছে সে বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে। বর্তমানে সে যশ প্রতিপত্তি নিয়ে ভালো আছে। তার পরও মমতার ভেতর একটা আক্ষেপ থেকেই গেল। বিয়ের পর সংসার টিকল না, স্বামীর আদর-ভালোবাসা সে পেল না।

বিয়ের পর স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব, কর্তব্য তুমি কি জান তুহিন? হঠাৎই বলে উঠলো মমতা।

জানি।

আমার মনে হয় তুমি জান না, সংসার সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণাই নেই।

এভাবে বলছ কেন?

কীভাবে বলবো বল! তুমি আমাকে বিয়ের পর কোনো দিন স্বামীর অধিকার চেয়ে কাছে আসনি। আমি জানি আমার দোষ ছিল, তবুও তোমার কি কর্তব্য ছিল না আমাকে সে দোষগুলো ধরিয়ে দিয়ে ফেরানো? মা আমার চলাফেরায় উচ্ছৃঙ্খলতা দেখে প্রায়ই বকা দিতো।

তুমি কেন আমাকে কিছু বলছো না? আমি তোমার স্ত্রী, বিয়ের পর একমাত্র স্বামীরাই পারে শাসন করতে, ভালোবাসতে, ভালোমন্দ শেয়ার করতে, ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিতে। আমার দুর্ভাগ্য যে তোমার সান্নিধ্য পাইনি! তুমি আমাকে কোনো দিন ভালোবাসনি।

বলেই মমতা ঢুকরে কেঁদে উঠলো।

তুহিন বিব্রত হলো। কী বলবে কী সান্ত্বনা দেবে বুঝতে পারছে না। মমতার দুহাত ধরতেই তার শরীর কেঁপে উঠলো। মমতা একটু শান্ত হলে তুহিন বলতে লাগলো-

মমতা সে সময়টা এতোই জটিল ছিল যে আমার কিছুই করার ছিল না।

কী হয়েছিল সে সময় তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করার সময় পেলে না? একটুও ভাবলে না তোমার মমকে জিজ্ঞেস করে তারপর ডিসিশন নেই?

তুহিন দু'হাতে মাথা চেপে ধরলো। সে চাচ্ছিল না মমতার অতীতটা বলতে।

মিলির মায়ের সঙ্গে তুহিনের পরিচয় হওয়ার সাত মাস পরই মিলির মা তুহিনকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। সেটা শুনে তুহিন খুব অবাক হয়। কারণ মিলি সবে এইচএসসি পাস করেছে। আরো পরে বিয়ে দিলে হয়। কিন্তু মিলির মায়ের যুক্তি শুনে সে রাজি হলো। মিলির উচ্ছৃঙ্খল জীবন তিনি পছন্দ করছেন না। তাই তিনি মিলিকে বিয়ে দিয়ে নিশ্চিত হতে চান। আশ্চর্যের বিষয় হলো, মিলিকে তুহিনের কথা বলাতে বিয়ের জন্য রাজি হলো।

তুহিন মিলিকে বিয়ের কথা বাসায় বললে প্রথমে আপত্তি করলেও পরে রাজি হয়, শুধু আক্দ হয়। তুহিন ছয় মাস পর তাকে বড় একটা রিসিপশন দিয়ে ঘরে তুলে নেবে। কিন্তু হলো না, এরই মাঝে তাদের ছাড়াছাড়ি হয়।

তোমাকে বিয়ের পরই আমি তোমার কিছু বন্ধুবান্ধবের ক্রোধের শিকার হই। সবাই ছিল তোমার খুব কাছের, তুমি তাদের সান্নিধ্যে থাকতে।

বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে তারা আমাকে হুমকি-ধমকি দিত, যেন তোমাকে আজই ছেড়ে দিই। তুমি তাদের।

আমি তাদের কথা পাত্তা দিতাম না। তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস ছিল।

রাতে যখন তোমার সঙ্গে কথা বলতাম, তখন আমার মন ভালো হয়ে যেত। আমি জানতাম তোমার বাইরের সৌন্দর্য আর ভেতরের সৌন্দর্যের মাঝে পার্থক্য নেই।

আমার সঙ্গে কোনোভাবে না পেরে তোমার বন্ধুরা তোমার কিছু ছবি নিয়ে আমার অফিসে আসে। সিবিচের ছবি, তুমি শর্ট ড্রেস পরে তাদের সঙ্গে মজা করছো।

আমি ছবিগুলো দেখে হাসলাম। সবাই অবাক হলো আমার কোনো রি-এ্যাক্ট না দেখে। আমি বললাম-

মমতার এসব ছবি তো খুবই সুন্দর হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে এসব ছবি আপনারা লুকিয়ে উঠিয়েছেন, নইলে আমি মমতার অ্যালবামে দেখতে পেতাম। বিয়ের আগে সে আপনাদের সঙ্গে কক্সবাজারে বেড়াতে গিয়েছিল, সেখানে সে একগাদা ছবি উঠিয়েছে, আমি তা দেখেছি। ভাই সমুদ্রের পাড়ে গোসল করতে গিয়ে তো ব্রা, আন্ডার গারমেন্টস্ পরতেই পারে। এতে দোষের কিছু নেই। আপনি যদি মনে করেন এতে আমার ভালোবাসা কমে যাবে, মমকে অবিশ্বাস করব, তাকে ছেড়ে

# ভালোবাসা অথবা অচিন ভায়োলিন

## রেদওয়ান খান

'জানো, রাতে আমি কি স্বপ্ন দেখেছি?' কফিতে চুমুক দিয়ে বলল শম্পা। আরেক মগ কফি তুলে দিল ফারুকের হাতে।

'কাল রাতে আমি কি স্বপ্ন দেখেছি বলো তো?'

অদ্ভুত কথা। আমি কি করে বলবো?'

'অনুমান করো না। তুমি দিন দিন কাঠ হয়ে যাচ্ছো ফারুক! এই আমি টিভি বন্ধ করলাম।

'মুশকিল। আচ্ছা বলছি, আমার ধারণা, তুমি স্বপ্নে দেখেছো আমাদের একটি ফুটফুটে ছানা হয়েছে। ছানাটি ছেলে না মেয়ে- অনুমান করতে পারছো না। ঠিক বলেছি?'

'তোমার মুন্ডু।'

'তা হলে বলো শুনি।' নিজের ঠান্ডা হয়ে ওঠা কফিতে চুমুক দিয়ে বলল ফারুক। তার চোখ ক্লোজআপ ওয়ানে। নোলকের গান।

শম্পা বিরক্ত। নোলক ওর পছন্দ না। ও এসএমএস করেছে রুমিকে। চোখ বুজে গান গায় রুমি- 'ভালোবাসি বলে রে বন্ধু আমায় কাঁদালে...।'

'কি অদ্ভুত বলো তো। স্বপ্ন দেখলাম জাফরকে।' বলল শম্পা। ওর কণ্ঠে খানিকটা বালিকাসুলভ আহ্লাদ টের পায় ফারুক। সে বলে-

'কাকে? ও, জাফর। ভালো!'

'ওই যে আমার পাগলা মামাতো ভাইটা। ইউনিভার্সিটিতে আমার পেছনে ঘুর ঘুর করতো। বলতো, শম্পা, প্লিজ, 'না' করো না!' তোমার মনে নেই?'

'মনে থাকবে না কেন। হঠাৎ আমার পাশে শুয়ে শুয়ে জাফরকে স্বপ্ন দেখার কি এমন দায় পড়েছে?' মৃদু খোঁচায় লাল হয়ে ওঠে শম্পা।

'ও এখন কোথায় আছে?' ফারুক বুঝতে পারে বেশি খোঁচা দিলে শম্পা কেঁদে ফেলবে।

'নিউজিল্যান্ড।'

'স্বপ্নের ডিটেলস্টা বলো।'

'দেখলাম, আমি জাফরের হাত ধরে নদীর পাড় দিয়ে হাঁটছি। নৌকা চলছে। সন্ধ্যাকাল। কোথা থেকে যেন এক মর্মস্পর্শী অচিন ভায়োলিন বেজে উঠছে। সেই ভায়োলিনের সুরে আমরা কাঁদছি। কি অদ্ভুত বলো তো? এ রকম স্বপ্নের কোনো মানে হয়?

ফারুক হ্যাঁ না কিছু বললো না। সে মনোযোগ দিয়ে ক্লোজআপ ওয়ানের বিউটির গান শুনছে। শম্পা বললো, 'তুমি মুখ কালো করে আছো? স্বপ্ন তো স্বপ্নই।'

'ভাবছি, এ রকম একটা মধুর স্বপ্ন আমিও দেখতে পারি কি না। আমাকে অবশ্যই এর চেয়ে রোমান্টিক একটা স্বপ্ন দেখতে হবে।'

'দেখবে। স্বপ্নে যদি তুমি অচিন ভায়োলিন শোনো তাতে সমস্যা কি। আমি তোমার মতো হিংসুক না।'

এ রকম স্বপ্ন-মধুর খুনসুটিতে রাত বাড়ে। শম্পার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শেষ হতে চায় না। বিয়ের আট বছর পরও শম্পা বালিকা রয়ে গেছে।

২. জাফর পাগলের মতো শম্পার পেছনে ঘুর ঘুর করতো। বাড়াবাড়ি রকমের। বন্ধুরাসহ হয়তো আড্ডা দিচ্ছে ক্যান্টিনে। ফারুক-শম্পা পাশাপাশি বসে। জাফর এসে বলতো, 'এই শম্পা, উঠে আয়, এখানে এসে বোস।'

শম্পা উঠে না, এলে ও নিজেই ফারুককে বলতো, 'কিছু মনে করো না, তুমি আমার চেয়ারটায় বসো।'

ফারুক কম কথা বলে। সে নীরবে উঠে জাফরের চেয়ারে বসতো। জাফর তখন কথার খই ফোটাতো। এই নিয়ে বন্ধুদের মধ্যে হাসাহাসি।

'কি রে শম্পা, দুই নৌকায় পা দিলে তো ছিঁড়ে যাবি। হা হা হা।' বলতো রিনি।

৩. ডাক্তার বলেছে, বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা শম্পার নেই। সমস্যা শম্পার না। সমস্যা হচ্ছে ফারুকের। ওর স্পার্ম নাকি খুবই দুর্বল।

শম্পার মন খারাপ। ফারুকেরও।

এ রকম মন খারাপ অবস্থায় ওরা উভয়ে উভয়কে যেন আরো নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করছে।

৪. শম্পা জানে না, আজকাল কেন জাফরকে মনে পড়ছে তার। তবে কি মনের কোনো গোপন কোটরে জাফরের জন্য সামান্য ভালোবাসা যত্ন করে রেখেছিল সে।

ফারুক অসম্ভব ভালো মানুষ। কিন্তু শম্পার মনে হয়, ক্ষতি কি যদি অন্য কারো জন্য মনের ভেতরটা মাঝে মাঝে মুচড়ে ওঠে।

শম্পাকে পায়নি বলে জাফর পালিয়ে গিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। যাওয়ার আগে শম্পাদের বাসায় এসে অনুনয় করে জাফর-

'শম্পা, শুধু একবার তুই 'না' বল, তাহলে আমি নিউজিল্যান্ড যাবো না।'

'বোকার মতো কথা বলবেন না।'

'আমি তো বোকাই।'

'আমি কি আপনাকে কখনো 'ভালোবাসি' বলেছি?'

'বলিসনি। আমি জানি, তুই আমাকে অসম্ভব ভালোবাসিস!' এ কথা শুনে শম্পা প্রায় কেঁদে ফেলেছিল।

৫. ডাক্তারের পরামর্শে ফারুককে নিয়ে শম্পা মাদ্রাজ যাচ্ছে আগামী সপ্তাহে। ওরা দু'জনেই একটি ফুটফুটে বাচ্চার জন্য হাহাকার করছে।

শম্পা ব্যাগ গোছাচ্ছিল। জরুরি কতো কিছু নিতে হবে। এসব কাজে জাফর নেই। সে ক্লোজআপ ওয়ান দেখতে দেখতে নাক ডাকছে। রাত ১২টা। শম্পার চোখে ঘুম নেই। সে জেগে আছে কেন বুঝতে পারছে না। রাত নিঝঝুম হয়ে এলে ক্যাঁত করে কলবেল বেজে ওঠে। এতো রাতে কে? বিরক্ত হয় সে। সে কি এ রকম একটা শব্দের জন্যই অপেক্ষা করছিল?

দরজা খুলে বিস্ময়ে থ হয়ে গেল শম্পা।

জাফর দাঁড়িয়ে আছে। তাকে মেইন গেট কে খুলে দিয়েছে- কে জানে।

'এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি তোর এখানে চলে এলাম। কেমন আছিস?'

তখন নিঝঝুম রাত্রিকে নাড়া দিয়ে শম্পার বুকের ভেতরটা অস্ফুট আর্তনাদ করে।

**বাড়ি# ৩২, রোড# ১৫**
**রূপনগর আ/এ, সেকশন-২**
**মিরপুর, ঢাকা-১২১৬**

দেব, তাহলে ভুল ভাবছেন। আপনাদের আমি কোনো দিন সে সুযোগ দেব না।

ওরা রেগে গেল। কথার ফাঁকে একজন যখন বলল-

বিয়ের পর আমাদের মাঝে শারীরিক সম্পর্ক হয়নি, আর সে বেঁচে থাকতে তোমাকে আমার শয্যাসঙ্গী হতে দেবে না।

কথাটা শোনার পর আমার খুবই খারাপ লেগেছিল। নিজেকে অপমানিত, ছোট লাগছিল। আমার কষ্ট হচ্ছিল এই ভেবে যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো কেন তুমি ওদের সঙ্গে শেয়ার কর! তোমার তো বোঝার এতোটুকু জ্ঞান হয়েছিল।

নিজের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করে তোমার সঙ্গে কথা বলতে যাই, গিয়ে দেখি তুমি নেই। আবার বাসায় আসার জন্য বললেও তুমি আসনি।

এ কারণে তুমি আমাকে ডিভোর্স দিয়ে দিলে?

না এ সামান্য কারণে আমি তোমাকে ডিভোর্স দেব কেন? আর এটা কোনো বিষয়ই না। আমি ভেবেছিলাম তোমার মেয়েলি কোনো সমস্যা হয়েছিল সে সময়, তাই আসনি।

তাহলে কেন তুমি আমাকে ডিভোর্স দিলে?

থাক না। এতো দিন পর এসব শুনে কী হবে বল? শুধু শুধু মন খারাপ করবে।

মন খারাপ হবে না। আমি সব শোনার জন্যই এখানে এসেছি, তোমার কাছে সময় চেয়ে নিয়েছি।

তুহিন মমতার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো আভিজাত্যের আড়ালেও সে বড্ড একা। বেচারা এতো কষ্ট পেতে পারে, তার বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। তুহিন খানিক ভেবে বলতে লাগল-

সে রাতের ঘটনার পর আমি সিদ্ধান্ত নিই তোমাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসবো। দাদীকে, মাকে বললাম। তারা আমার কথায় অবাক হলেও খুশি হয়েছিল। তারাও চাইছিল বউকে নিয়ে থাকতে। সবকিছু যখন ঠিকঠাক তখন তোমার বন্ধুরা শেষ অস্ত্রটা আমাদের পরিবারের দিকে ছুঁড়ে মারলো।

মমতা অবাক হয়ে তুহিনের দিকে তাকালো। তুহিন অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলতে লাগলো-

হঠাৎ একটা পার্সেলের প্যাকেট আমার জীবনটা উল্টা-পাল্টা করে দিল।

প্যাকেটে তোমার সঙ্গে রাফিসহ অন্যদের কিছু আপত্তিকর ছবি আর ভিডিও ফুটেজ ছিল। প্রথমে আমিও বিভ্রম হয়ে গিয়েছিলাম।

কিন্তু আমি আমাদের পরিবারের লোকদের বোঝাতে ব্যর্থ হই এটা একটা সাজানো ছবি। তোমার কিছু ছবি কপি পেস্ট করে কাজটা করা হয়েছে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে, দক্ষ হাতে।

আমার অনুরোধ উপেক্ষা করে মা এগুলো তোমার মা-বাবাকে দেখায়। তারা আমাদের ওপর ছেড়ে দেয়, আমাদের যা খুশি তা করার অনুমতি দিয়ে যায়।

তার পরও আমি তোমার পক্ষে ছিলাম। রাগ করে বাড়ির বাইরে ছিলাম সাত দিন, শেষে বাবা-মা'র কাছে, দাদীর কাছে পরাজিত হই। তোমাকে আমি চিরদিনের জন্য ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিই।

তোমাকে ডিভোর্স দেবার আগে তাদের কিছু শর্ত দিয়েছিলাম। মিনিমাম তিন বছরের জন্য বিদেশে যাবার অনুমতি দিতে হবে। এমবিএ করার জন্য আমি লন্ডন চলে যাই। যেদিন ফ্লাইট সেদিনই ডিভোর্সে সই করি, পরাজিত হই রাফির কাছে।

উফ্ রাফি... আমার বন্ধুরা আমার জীবনটা এভাবে নষ্ট করে দিল! বলেই সে ঢুকরে কেঁদে উঠলো। তুহিন মমতাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল।

ডিভোর্স লেটার পেয়ে মমতা পাগলের মতো হয়ে যায়। অনেক খোঁজ করে তুহিনকে, কেউ তাকে বলতে পারেনি তুহিন কোথায়। কোনো উপায় না দেখে ওদের বাসায় ফোন করে। বাসার কেউ ঠিকভাবে কথা বলছে না। নাম শুনলেই ফোন রেখে দিচ্ছে। মা-বাবাও বলল না কেন তাকে তুহিন ডিভোর্স দিল? তুমি খুব ডিপ্রেস হয়েছ না? আমি জানতাম তোমার কষ্ট হবে, তুমি সহ্য করতে পারবে না। আমি খুবই দুঃখিত এর জন্য।

তুমি কেন একবার আমাকে বললে না আমার বন্ধুরা তোমার সঙ্গে এমন করছিল? কেন...?

তুহিন মমতার কাছে গিয়ে তার দুহাত ধরতেই ঢুকরে কেঁদে উঠল। তুহিনের খুব খারাপ লাগছিল মমতার কান্নায়। তারই কিছু ভুলে আর উদাসীনতার কারণে মমতাকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পায়নি, যখনই মনে হয় তার খুবই খারাপ লাগে। সে মমতাকে বলতেই পারতো। মানুষ কি ঠিক সময় তার ভুলগুলো ধরতে পারে না?

কিছুক্ষণ পর মমতার দু'চোখের পানি মুছে দিয়ে তুহিন বলল-

মমতা, আমি তোমাকে অনেক আশা করে বিয়ে করেছিলাম। বিয়ের পর আমি-তুমি ছোট একটা সংসার সাজাব, সেটা হলো না। আমার ভাগ্যটাই খারাপ।

কিছুক্ষণ পর মমতা চলে যাবার জন্য দজার কাছে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তুহিনের দিকে তাকালো। তুহিন চোখে হাত দিয়ে অন্য দিকে ফিরল। মমতা দৌড়ে এসে তুহিনকে জড়িয়ে ধরল। তুহিন মমতাকে বুকে চেপে ধরে ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো।

**কৃষনোপুর, সুয়াগঞ্জ-৩৫০৪, কুমিল্লা**

# অর্ধেক কল্পনা

**সবুজ**

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে ফেরার সময় ট্রেনে মেয়েটিকে প্রথম দেখি। এ সময় ট্রেনে প্রচুর ভিড় হয়। আসার দিন নির্ধারিত কামরায় উঠে কিছু বাক্যবিনিময়ের পর সিট দখল করে দাঁড়িয়ে আছি। কারণ আমরা সিট পেয়েছি একটা আর মানুষ হচ্ছি তিনজন। আবিদ সিটে বসেছে আর আমি ও ইমরান কোনো রকমে দাঁড়িয়ে লোকজনের ঠেলা খাচ্ছি। হঠাৎ পেছন থেকে একটা মিষ্টি কণ্ঠ বলে উঠলো- 'দেখি'। আমি 'দেখেন' বলতে গিয়ে মেয়েটির চোখে চোখ পড়তেই থেমে গেলাম। কী! শান্ত চোখ কী! মায়াবী! ধুৎ, হচ্ছে না। আমার দুর্ভাগ্য আমি কবি নই। ঐ চোখের সৌন্দর্যের বর্ণনা শুধু কোনো কবির পক্ষেই দেয়া সম্ভব। আমি কোনো রকমে পিছিয়ে সামনে জায়গা করে দিলাম। মেয়েটি তার বান্ধবীকে নিয়ে এপাশে এসে দাঁড়ালো। আমি আবিদের কানে কানে বললাম- দোস্ত, গেছি।

আবিদ আমার অবস্থা বুঝেছে। তাই রসিকতা করে বলল- এ নিয়ে কতবার? আমিও পাল্টা রসিকতায় দেশের একজন রাজনীতিবিদের নামে কসম কেটে বললাম, এটাই শেষ। আবিদ আমার ভঙ্গি দেখে হেসে বলল, দোস্ত মেয়েটা তো কালো। আমি ওকে ঝারি দিয়ে বললাম, কালো তো তোর কী? চোখ দেখেছিস? একশ হেলেনের চোখ ঘুটেও ওর বাম চোখের মতো একটা চোখ বানানো যাবে না। আর হাসি? ওফ! এক হাজার ক্লিওপেট্রা মিলেও ঐ হাসি দিতে পারবে না।

- আরে বাবা থাম, লেকচার দিস না। মিনতি করলো আবিদ। এরই মাঝে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। আড়চোখে বারবার মেয়েটাকে দেখছি, আর ইমরান পেছন থেকে আমাকে সমানে খোঁচাচ্ছে। আবিদ কী জানি মনে করে সিট ছেড়ে ওদের বসতে দিল। কিছুক্ষণ পর দেখি ঐ মেয়ের বান্ধবীর সঙ্গে

আবিদের গল্প জমে উঠেছে। আমি আর ইমরানও গল্পে যোগ দিলাম। জানা গেল বান্ধবীর নাম রিমি এবং ঐ মেয়ের নাম মৌনতা। দু'জনই খুলনায় থাকে। খুবই ভালো ছাত্রী। আমাদের মতো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছে। এক স্টেশনে ট্রেন আসতে ইমরান একগাদা বাদাম কিনল। বাদাম খাচ্ছি আর আড্ডা দিচ্ছি। এতো কথা হচ্ছে, কিন্তু মৌনতা তার নামের সঙ্গে মিল রেখে একদম মৌন। এভাবে কথায় কথায় আমাদের গন্তব্য চলে এল। আবিদ আর ইমরান প্লাটফর্মে নেমে ওপাশের জানালা দিয়ে রিমির সঙ্গে কথা বলছে। আমি নামবার আগে মৌনতার দিকে তাকিয়ে সাহস করে বললাম- আসি।

মৌনতা কিছু না বলে মৃদু হেসে মাথা নাড়ল।

মৌনতা, সঙ্গে আমার হৃদয় নিয়ে ট্রেন চলে গেল। তার পরও আমরা তিনজন প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি। আমি ইমরানকে বললাম রিমির ফোন নম্বর লেখা কাগজটা দে।

ইমরান খানিকক্ষণ এ-পকেট ও-পকেট খুঁজে হতভম্বের মতো বলল- দোস্ত, পাচ্ছি না।

আমি খুব প্রিয় কিছু হারানোর বেদনা এবং রাগ নিয়ে ওর পশ্চাৎদেশে জোরে এক লাথি কষলাম।

দুই. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটছি। কাকতালীয় হোক আর বকতালীয়ই হোক, হঠাৎ রাস্তার বিপরীত পাশে দেখি মৌনতা। আমি জায়গায় জমে গেলাম। ওর সঙ্গে যে আবার কোনো দিন দেখা হবে আশাই করিনি। আমাকে দেখেছে কি না বুঝলাম না। ও রাস্তা পার হয়ে উল্টোদিকে হাঁটা দিল। আমি ওর পিছু নিলাম। এভাবে প্রায় মিনিট পাঁচেক চলার পর একটা মোড় ঘুরেই দেখি ও নেই। আমার তখন মাথা খারাপ হবার অবস্থা। ইচ্ছে হচ্ছে মৌনতা বলে জোরে চিৎকার করতে। আমি যখন আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছি, তখন পেছন থেকে কে যেন বলল, আমাকে খুঁজছেন?

ঝট করে ফিরে দেখি মৌনতা মিটিমিটি হাসছে। ইচ্ছে হলো বলি- না, আপনাকে খুঁজতে যাবো কেন? কিন্তু টেনশনে বোধহয় ঘাড়ের নাটবল্টু ঢিলা হয়ে গেছে, তাই শুধু ওপর-নিচে মাথা নাড়লাম।

ও বলল, ও রকম পিছু পিছু হাঁটছিলেন কেন?

- সামনে আসতে সাহস পাইনি। যদি বলেন 'চিনি না'। কিন্তু আপনি তো কথা বলতে পারতেন।

- আমিও ঐ জন্য কথা বলিনি।

- না, তা কেন! আমি আপনাকে চিনি না বলব কেন?

- হু, চিনি না বলব কেন? আমাকে ব্যাঙ্গ করল ও। তারপর বলল

বলবেন দুটো কারণে।

- বলেন, দুটো কারণই শুনি।

- প্রথম কারণ হচ্ছে, রিমি আপনাদের কাছে ফোন নম্বর দিয়েছিলো। কিন্তু আপনারা ফোন করেননি।

- ও, এই কথা! ইমরানের বাচ্চা নম্বর লেখা কাগজটা হারিয়ে ফেলেছিল।

- ইমরানের বাচ্চা! অবাক হবার ভান করলো মৌনতা।

- ঐ আর কি, ইমরানের বাপের বাচ্চা। রসিকতা করলাম আমি। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম- আর দ্বিতীয় কারণ?

- দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, আমি যে কালো!

এ কথার কী জবাব দেবো আমি! কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম, রিমি আসেনি?

- না, ওর জ্বর।

এরপর দু'জনই চুপ। কিছু সময় পর ও বলল, আমি যাবো?

- খুলনা ফিরছেন কবে?

- কাল। আপনি যশোর ফিরছেন কবে?

- পরশু।

ও একটা রিকশা ডেকে উঠে বসার পর বললাম, আজ ফেব্রুয়ারি ১০। ১৪ তারিখ বেলা ১১টায় জিয়া হলের সামনে থাকতে পারবেন?

- কেন?

যা হয় হোক ভেবে বললাম, আপনার দ্বিতীয় কারণ সম্পর্কে কিছু বলতাম।

- এখন বলেন।

- না, ঐদিন বলবো।

ও কিছু সময় আমার চোখের দিকে চেয়ে থেকে মৃদু হেসে বলল- আচ্ছা থাকবো।

ও চলে গেল। আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম, কারণ-টারণ সব বাদ। ঐদিন সোজা বলবো- 'ভালোবাসী'।

**সবুজ**
**প্রযত্নে : জাহানারা বেগম, বাসা নং ১/সি**
**অভয়নগর থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স**
**নওয়াপাড়া, যশোর**

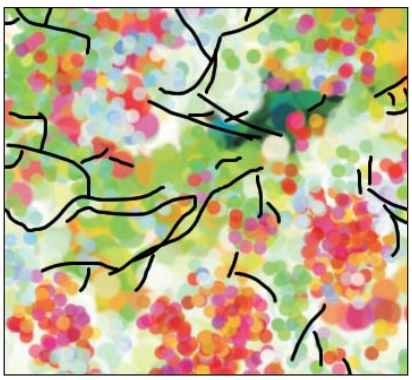

# বৃষ্টির চোখে জল

**তানভীর হাসান**

নোলকের গানই আমার কাছে বেশি ভালো লাগে, নাতাশা বলল। আরে ধর, রাশেদ সেরা- উপল বলল। তোর কাকে ভালো লাগে রে বৃষ্টি? নাতাশা প্রশ্ন করলো। উম্‌ম, বিউটি। বিউটির লালনগীতি আমাকে মুগ্ধ করে। গতকাল শেষ হওয়া ক্লোজআপ ওয়ান অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করছে ওরা তিন বন্ধু। তিনজনেই সিটি কলেজে বিকম পড়ছে। বৃষ্টির মোবাইলে মিস্‌ড কল আসলো। এ্যাই আমি বাইরে, ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে আসছে, কাল দেখা হবে বলেই বৃষ্টি চলে গেল। উপল সেদিকে তাকিয়ে থাকে। নাতাশা প্রশ্ন করে, তুই ওকে খুব ভালোবাসিস নারে উপল? উপল অবাক হয়। নাতাশা হাসে। উপল মনে মনে চমকায়, নাতাশা কি কখনোই বুঝবে না উপল কি চায়? নাতাশাকে উপলের খুব পছন্দ। নাতাশাও মনে প্রাণে উপলকেই চায়। কিন্তু কেউ কাউকে বলতে পারে না। বৃষ্টি নামটা খুব বাহ্যিক নারে উপল। হুম, মাথা নাড়ে উপল। নাতাশা আবার বলে, এতো বড়লোক ওরা অথচ কাব্যিক নাম, আর আমার নাম কি না নাতাশা, কেমন বাতাসা বাতাসা মনে হয়। উপল হেসে ওঠে, বলে, তোরাও কি কম বড়লোক নাকি? বাদ দে তো, চল এবার উঠি। দুজনে হাঁটতে হাঁটতে বাস কাউন্টারের কাছে আসে। উপল দুটো টিকেট কাটে। একটি উত্তরা আরেকটি বনানী। বনানীর টিকেটটা নাতাশাকে দেয়। দুজনে বাসে পাশাপাশি বসে আছে। বাসে একটা ছেলে বারবার নাতাশাকে দেখে। উপলের ভালো লাগে না। নাতাশা পাশে বসা উপলকে আড় চোখে দেখে আর মনে মনে হাসে।

## দুই.

বৃষ্টি গান শুনছে খুব মনোযোগ দিয়ে। হঠাৎ ফোন এলো নাতাশার। কি রে- কি খবর? কি করছিস্, নাতাশা। গান শুনছি- বৃষ্টি বলে। আচ্ছা বৃষ্টি তুই কি উপলকে খুব ভালোবাসিস? নাতাশা জানতে চায়। বৃষ্টির বুক ধড়াস করে ওঠে। কি করে সে সত্যি কথাটা বলবে বুঝতে পারে না। চুপ করে থাকে। কিছু পরে বলে, আরে না না। উপল আমার খুব ভালো বন্ধু। বন্ধু মনে করেই খুব পছন্দ করি। বৃষ্টি জানায়। নাতাশা আশ্বস্ত হয়। বৃষ্টি জানতে চায়, তুই কি লাইক করিস উপলকে!

নাতাশা হো হো করে হেসে ওঠে। বলে, তোকে বলেছি না আমার অ্যাফেয়ার আছে একজনের সঙ্গে। অপেক্ষা কর কিছুদিন পর পরিচয় করিয়ে দেবো। নাতাশা উত্তর দেয়। এবার বৃষ্টিও আশ্বস্ত হয়। এটা বোঝেনা যে

নাতাশা আসলে উপলের কথাই বুঝিয়েছে বৃষ্টি স্বপ্ন বুনতে শুরু করে। উপলের হাতে হাত রেখে সে ধানমন্ডি লেকে বসে আছে। উপল সাদা পাঞ্জাবি পরা। আর বৃষ্টি লাল শিফন জর্জেট শাড়ি পরে আছে। উপল মুগ্ধ হয়ে বৃষ্টিকে দেখে। বৃষ্টি লজ্জা পায়। এসব চিন্তা করতে করতেই বৃষ্টির মা ওকে খেতে ডাকে। বৃষ্টি খুশি মনে ডাইনিং টেবিলের দিকে পা বাড়ায়।

## তিন.

একা একা উপল ছাদে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সুন্দর সন্ধ্যায় একা একা থাকাটা বেশ কষ্টের। উপল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এমন সুন্দর সন্ধ্যায় যদি পাশে নাতাশা থাকতো, এটা ভাবতেই উপলের মন খুশি হয়ে গেল। নাতাশাকে উপলের খুব পছন্দ। খুব ফর্সা আর স্মার্ট মেয়ে। দেখতেও সুন্দরী। নাতাশাকে ভালোবাসার কথা জানাতে উপলের খুব ইচ্ছে করে। দু'একদিনের মধ্যে অবশ্যই সে নাতাশাকে জানাবে। কিছুদিন পরেই ভ্যালেন্টাইন ডে। এবার সে ভ্যালেন্টাইন ডেতে নাতাশার সঙ্গে সারা দিন কাটাবে। দারুণ হবে। উপল বৃষ্টিকে ফোন করলো। উপল- হ্যালো বৃষ্টি? কি করিস! বৃষ্টি- কিছু না, মনে মনে বলল- তোমার কথাই ভাবছিলাম। উপল- আচ্ছা, নাতাশাকে তোর কেমন লাগে। বৃষ্টি- ভালো লাগে, কেন কি হয়েছে? উপল- নাহ্, এমনিতেই। আচ্ছা ওর কি অ্যাফেয়ার আছে? বৃষ্টি- আমাকে তো বলল ও নাকি কাকে খুব ভালোবাসে কিন্তু আমি চিনি না। এ কথা শুনেই উপল চুপসে যায়। ওহ্, ভালো তো তাহলে, তা তোর কি খবর? উপলের প্রশ্ন। বৃষ্টি উত্তর দেয়- হুম্, আমারও আছে। ভ্যালেন্টাইন ডেতে তোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো। ও কে, উপল বলে। বৃষ্টি খুব খুশি হয়। এবার ভ্যালেন্টাইন ডেতে সে উপলকে তার আজন্ম লালিত ভালোবাসার কথা জানাবে। এদিকে নাতাশাও উপলকে সারপ্রাইজ দিতে চায় ভ্যালেন্টাইন ডেতে ।

## চার.

আজ ১৪ ফেব্রুয়ারি। ভ্যালেন্টাইন ডে। বৃষ্টি সকাল থেকে খুব নিখুঁত করে সাজগোজ করছে। লাল একটা জর্জেট শাড়ি পরল। কপালে লাল ছোট্ট একটা টিপ। কানে ঝুমকা। হাত ভর্তি কাচের চুড়ি। বাহ্, আয়নায় নিজেকে দেখে বৃষ্টি নিজেই চমকে গেল। নাতাশাও থেমে নেই। সে একটা নীল শাড়ি পরল। গাঢ় করে লিপস্টিক দিল। নীল টিপ আঁকল আকাশে। কপালের আকাশে। নাহ্, আজ নাতাশাকেও দারুণ দেখাচ্ছে। নাতাশা উপলকে ফোন করে সাদা পাঞ্জাবি পরে আসতে বলল। উপল সাদা পাঞ্জাবি পরে ধানমন্ডি লেকে ওদের জন্য অপেক্ষা করছে। বৃষ্টি আগে এলো। দূর থেকে উপলকে দেখে ও চমকে যায়। একি! উপল কি করে ওর মনের কথা জানল? সাদা পাঞ্জাবিতে উপলকে দেখেই মুগ্ধ হয় বৃষ্টি। বৃষ্টি আজ তোকে দারুণ দেখাচ্ছে। বৃষ্টি লজ্জা পায়। মৃদু হেসে উপলকে বলে- হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন ডে। উপলও একই উত্তর দেয়। এর মধ্যে নাতাশা এসে হাজির। নাতাশাকে নীল শাড়িতে দেখে উপলের বুকে মোচড় দেয়। হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন ডে তোদের দুজনকে, নাতাশা বলে। বৃষ্টি জানতে চায়, তোর ভালোবাসার মানুষ কই রে? নাতাশা হেসে বলে, আজ তোর কাছেই আছে। বৃষ্টি ভ্রু কুঁচকায়। উপল অবাক হয়। নাতাশা উপলের হাত ধরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, এটাই আমার ভ্যালেন্টাইন রে বৃষ্টি। ঘটনার আকস্মিকতায় বৃষ্টি ও উপল দু'জনেই বিস্মিত। নাতাশা আবার বলে, উপলকে আমি খুব বেশি ভালোবাসি, অনেক দিন থেকেই। তোদের সারপ্রাইজ দেবো বলেই এতোদিন বলিনি। উপল বোকার মতো বলে ফেলে- আই লাভ ইউ নাতাশা। নাতাশা বলে- মি টু। ওদের কথা এতোক্ষণ ধরে বৃষ্টি শুনছিল। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে বৃষ্টি ওদের দিকে। উপল বলে, তোর ভ্যালেন্টাইন কইরে বৃষ্টি? বৃষ্টি হেসে বলে, আমি তোর সঙ্গে ফান করেছিলাম রে বোকা। নাতাশা আর উপল হো হো করে হেসে ওঠে। দুজন দুজনের হাত ধরে থাকে। কেউ খেয়াল করে না যে বৃষ্টির চোখে ততক্ষণে জল এসে গেছে।

**তানভীর হাসান**
**৪২/বি, সালেক রোড, ঝিগাতলা**
**ঢাকা-১২০৯, ফ্লাট-৪ বি**

---

# স্বপ্নীলের স্বপ্নঘর

**জান্নাতুল ফেরদৌস**

সকালবেলা। সূর্যদেব তার আনন্দরশ্মি দিয়ে ধীরে ধীরে আলোকিত করছে এই ধুলোমাটির পৃথিবীটাকে। পরম মমতায়, পরম আদরে পৃথিবীকে বরণ করছে তার সোনালী চাদরে। জানালার পর্দাটা টেনে দিতে দিতে সেই পরম মমতার ছোঁয়াই যেন গায়ে মেখে নিচ্ছিল সারাহ্ । দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে সারাহ্র মনে পড়ছে কতই না কবিতা। এক চমৎকার, উদাত্ত গলার অধিকারী যেন একের পর এক কবিতা আবৃত্তি করছে সারাহ্র হৃদয়-আঙিনায় বসে বসে। বুকের মধ্যখান থেকে এক পাজরভাঙা দীর্ঘশ্বাস উঠে কেঁপে কেঁপে ছড়িয়ে গেল ভোরের সেই স্বর্গীয় আলোয়।

আজ ২১শে মে। প্রতিবছর ২১ আসে ওকে কাঁদায়। দেখতে দেখতে পাঁচ বছর কেটে গেল! হায় সময়! পাঁচ বছর চলে গেছে, তবুও স্বপ্নীল হারায়নি সারাহ্র হৃদয় থেকে এক মুহূর্তের জন্যও। আজ ওর মৃত্যুবার্ষিকী। কি মধুর ছিল সেই দিনগুলো। স্বপ্নীলের আবৃত্তিতে ভরে থাকত সময়গুলো। কত কবিতাই যে ওর মুখস্থ ছিল ভাবতেও অবাক লাগে। কোনো ডাক্তার যে এভাবে কবিতা পড়ে বা পড়ার সময় পায় তা বোধহয় স্বপ্নীলকে না দেখলে সারাহ্ বিশ্বাসই করত না। কি থেকে কি হয়ে গেল। আজ কোথায়? কোথায় তুমি? নিশ্চুপ আকাশের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে নিজেও নিশ্চুপ হয়ে যায় সারাহ্। মন চলে যায় সেই প্রথম দেখার অম্লান লগ্নে-

ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাচ্ছিল সারাহ্। ছুটি কাটাতে। সেই ট্রেনেই পরিচয় তার ভাবনার রাজকুমারের সঙ্গে।

ট্রেনে ওঠে সারাহ্ । নির্দিষ্ট সিটে বসে দেখে পাশের সিটটিতে তখনও কেউ আসেনি।

কে জানে কে বসবে এখানে, কথাবলা লোক হলেই বাঁচি। আপন মনেই ভাবল সারাহ্।

ট্রেন ছাড়ার দশ মিনিট আগে সারাহ্র পাশের সিটে এসে ঝপ করে বসে পড়ল এক যুবক। বেশ লম্বা। সুদর্শন। চোখে চশমা। ঢাকায় পড়াশোনা করে বলে বহুবার সারাহ্কে ট্রেন জার্নি করতে হয়েছে। কত মানুষের সঙ্গে যে পরিচয় হয়েছে তা বোধহয় সারাহ্ নিজেও জানে না। কিন্তু এমন অনুভূতির শিকার হয়নি কখনও। কেমন যেন একটা আকর্ষণ অনুভব করে সারাহ্। আড়চোখে আগন্তুককে দেখতে দেখতে ভাবে সারাহ্- কি গম্ভীর রে বাবা। হঠাৎ পাশ থেকে চমৎকার ভরাট কণ্ঠস্বর

সারাহ্‌কে ফিরে তাকাতে বাধ্য করে-

- কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা বলি। আমি বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারি না। যদি আপত্তি না থাকে আসুন পরিচিত হই। আমি স্বপ্নীল আহমেদ। ঢাকা মেডিকেলের ছাত্র। আপনি?

- না না, কি মনে করব। আমি সারাহ্ জাফরিন। ঢাকা ভার্সিটিতে বাংলায় অনার্স করছি। চট্টগ্রামে যাচ্ছি ছুটি কাটাতে। বাবা-মা আর ছোট্ট ভাইটার সঙ্গে দেখা করতে।

- আমার গন্তব্যও অবশ্যই চট্টগ্রাম। যেহেতু এটি চট্টগ্রামেরই ট্রেন। তবে উদ্দেশ্য সাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা।

- আপনার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু বুঝি?

- কে ? সাগর? আরে না না। এই সাগর সেই সাগর নয়। আমি সমুদ্রর কথা বলছি। বলেই হা হা করে হেসে সারাহ্‌কে অপ্রতিভ করে দিল স্বপ্নীল।

মনে মনে লজ্জিত হলেও খুশি হয় সারাহ্। বেশ চমৎকার মানুষ। কি স্বতঃস্ফূর্ত কথাবার্তা। ধীরে ধীরে আকর্ষণ বাড়ছেই। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবে সারাহ্।

ট্রেন চলছে। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিপরীত দিকে হারিয়ে যাচ্ছে সমস্ত প্রকৃতি। এসব দেখতে সারাহ্‌র খুব ভালো লাগে।

স্বপ্নীল বেশ মিশুক ছেলে। আস্তে আস্তে কত বিষয় নিয়ে কথা হয় দুজনার। স্বপ্নীল কবিতা খুব পছন্দ করে। আবৃত্তিও করে চমৎকার। সারাহ্‌কে কবিতা শুনিয়ে মুগ্ধ করে দিলো একেবারে। সারাহ্ সভয়ে ভাবে, আর কি কি গুন আছে মানুষটার?

ট্রেন স্টেশনে থামে।

নানা রকম আওয়াজ ভেসে আসে। হকার, কুলি, চা-ওয়ালা কত মানুষ। এক আচার বিক্রেতার কাছ থেকে তেঁতুলের আচার কিনে পরম তৃপ্তিতে মুখে দেয় সারাহ্ । সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে স্বপ্নীল বলে ওঠে,

- এই যে আপনি তেঁতুলের আচার খাচ্ছেন, এটি কি আপনার শরীরের জন্য ভালো? এর চেয়ে কোনো ফল খাওয়া কি ভালো নয়?

- ওহো, আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম আমি বর্তমানে একজন হবু ডাক্তারের সহযাত্রী। কিন্তু ডাক্তার সাহেব এই তেঁতুলের আচার আমার খুবই প্রিয়। আপনার কোনো কথাই আমাকে আটকাতে পারবে না। আমি খাবই। বলেই খিল খিল করে হেসে ওঠে সারাহ্। তার সঙ্গে স্বপ্নীলও। এভাবেই কেটে যায় সারা পথ।

হাসি, কবিতা, কথা আর ভালোলাগায়।

ট্রেন চট্টগ্রাম স্টেশনে পৌঁছতেই সারাহ্‌র মনে হয়, আজ খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেছে। বিদায় নেবার বেলায় স্বপ্নীল বলে ওঠে-

- খুবই ভালো লাগল আপনার সঙ্গ। যদি পথের বন্ধুকে ভালো লাগে তবে প্লিজ যোগাযোগ করবেন। বলেই ঠিকানা আর ফোন নাম্বার লেখা একটা কাগজ গুঁজে দেয় সারাহ্‌র হাতে।

- নিশ্চয়ই। আমি অবশ্যই যোগাযোগ করব। ম্লান হাসি দিয়ে বলে সারাহ্।

এরপর বিদায়।

রিকশায় যেতে যেতে সারাহ্ ভাবে- অবশ্যই বন্ধুত্ব করবো। তবে স্বপ্নীলেরই বাংলায় পড়া উচিত ছিল। যা কবি কবি ভাব। হাসির ছটা আলোকিত করে দেয় সারাহ্‌র চমৎকার মুখশ্রীটাকে।

দুই সপ্তাহ পর-

একদিন সারাহ্ ফোন করে স্বপ্নীলকে তারপর। থেকে পথচলা দুজনের। কথা, কবিতা আর হাসিতে ভরে ছিল দু-জনের দিন-মাস-সময়গুলো।

দেখতে দেখতে চলে আসে ১৪ ফেব্রুয়ারি। স্বপ্নীল সারাহ্‌কে বলে বইমেলায় আসতে। তাকে নাকি আজ চমকে দেবে।

সারাহ্ তার প্রিয় সবুজ জামদানিটা পরে। কপালে টিপ, হাতে চুড়ি। ঠিক যেমন স্বপ্নীল পছন্দ করে। নির্দিষ্ট সময়ে বইমেলায় পৌঁছে দেখে এ যেন এক প্রাণের মেলা। চারিদিকে শুধুই আনন্দ। স্বপ্নীল আসে। সাদা পাঞ্জাবীতে ওকে যেন দেবদূত বলেই মনে হয় সারাহ্‌র কাছে। হাতের লাল গোলাপগুলো সারাহ্‌কে দিয়ে বলে-

- সব কথা সব সময় বলা যায় না। কিছু কথা বলার জন্য মাহেন্দ্রক্ষণ লাগে। আজকের এই সময়টার জন্য অপেক্ষা করেছি কতদিন থেকে। সারাহ্, তুমি কি আমাকে সঙ্গী করবে তোমার ভবিষ্যতের রথে, তোমার স্বপ্নালোকে, তোমার হাসি কান্নার জীবনে?

সারাহ্ কথা খুঁজে পায় না। সে নিজেও তো অপেক্ষা করেছে এই দিনটির, এই ক্ষণটির জন্য আকুল ভাবে।

হাত বাড়িয়ে ফুলগুলো নিয়ে সারাহ্ বলে-

- নেব স্বপ্নীল। তোমাকে আমার সমস্ত অস্তিত্বের সঙ্গেই নেব। আমার স্বপ্নে, আমার হাসি-কান্নায়, আমার ভবিষ্যতে।

হাসি ফুটে ওঠে স্বপ্নীলের মুখে। আর সারাহ্‌র মনে হয় তার সমস্ত পৃথিবীটাই যেন আজ হাসছে।

স্বপ্নীল সব সময় তার তিনটা স্বপ্নের কথা বলতো। শোনাতো সারাহ্‌কে তার রঙিন স্বপ্নের কথা-

- জানো সারাহ্, আমার তিনটি স্বপ্ন আছে। যখন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার হব তখন গরিবদের সেবা করব বিনে পয়সায়। একটা লাইব্রেরি করবো। থরে থরে সাজানো থাকবে বিখ্যাত কবিদের কবিতার বই। সবাই এসে এসে পড়বে আর ভালোবাসবে এই পৃথিবীটাকে। আর তিন নম্বর স্বপ্ন হচ্ছে, তোমাকে নিয়ে কক্সবাজারে সমুদ্র দেখতে যাওয়া। দুজন মিলে সূর্যাস্ত দেখব, দেখব পাখির নীড়ে ফেরা, ঢেউয়ের না বলা কথা, শুনবো তোমার- আমার ভালোবাসায় সিক্ত হৃদয় দিয়ে। থাকবে না সারাহ্ আমার পাশে, এই স্বপ্ন পূরণে?

-নিশ্চয়ই থাকব, স্বপ্নীল। তোমার স্বপ্নগুলোই তো আমার স্বপ্ন। আমার-তোমার, আমাদের স্বপ্ন।

এভাবেই কেটে যাচ্ছিল দুজনার সময়গুলো প্রজাপতির ডানায় ভর করে, সময়কে সাথী করে।

বছর ঘুরে আসে ২১শে মে। সারাহ্‌র জন্মদিন। আজ দু'জন মিলে হারিয়ে যাবে অজানায়, কথায় আর কবিতায়।

শাহবাগে রিকশা থেকে নেমে সারাহ্ ভাড়া দেয়। হঠাৎ চোখ পড়ে একটা জটলার দিকে। অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে ভিড় করে আছে। কৌতূহলের বশে সারাহ্ এগিয়ে যায়। লাল গোলাপ, চশমা ছিটকে পড়েছে সাদা পাঞ্জাবী পরিহিত মৃত যুবকের আশপাশে। রক্তে লাল হয়ে যাওয়া পাঞ্জাবী পরা যুবকের মুখের দিকে তাকিয়ে সারাহ্‌র পুরো পৃথিবীটা দুলে ওঠে।

আজ সারাহ্ বড় একা। একটা চাকরি নিয়ে চলে এসেছে চট্টগ্রামে। চাকরির পরবর্তী সময়টুকু চলে যায় স্বপ্নীলের সেই লাইব্রেরিতে। কত উৎসুক পাঠক বইয়ের মধ্যে ডুবে যায়। আর সারাহ্ অনুভব করে স্বপ্নীলের কবিতার প্রতি ভালোবাসা এই পাঠকদের দিকে তাকিয়ে। গরিব-দুঃখীদের সেবা করার সেই স্বপ্নটাকে সারাহ্ অর্পণ করেছে ওর সতীর্থদের কাছে। আর শেষ স্বপ্নটা, সেটা পূরণ হয়নি- হবে না। স্বপ্নটা স্বপ্নীল ছাড়া সারাহ্ কিভাবে দেখবে সূর্যাস্ত, পাখির ঘরে ফেরা, কিভাবে শুনবে ঢেউয়ের না-বলা কথা?

অতীতের ছায়াঘেরা সময় থেকে উঠে আসে সারাহ্ বড় নিষ্ঠুর, একা বর্তমানে। সেখানে এখন শুধুই নিঃস্বতা, হাহাকার। অন্তর থেকে উৎসারিত হতে থাকে স্বপ্নীলের আবৃত্তি করা সেই কবিতাটি।

আঁখি সিক্ত করি তুমি দূর আকাশে
কান পেতে শুনে নিও
আমার ভালোবাসার আর্তনাদ।
তরঙ্গের ঢেউয়ে অনুভবের চোখ দিয়ে
পড়ে নিও
আমার প্রেমের কবিতাগুলো।
কাফন ঢাকা মুখ খুলি তুমি
বুঝে নিও
মোর ভালোবাসার গভীরতা।

সারাহ্‌র কানে বাজতে থাকে সেই মোহনীয় কণ্ঠস্বর। আর ঝাপসা হয়ে আসে নীল আকাশ, সোনালী রোদ।

**প্রযত্নে : আব্দুল খালেক**
**৩২৬/বি, খিলগাঁও তালতলা (৫ম তলা)**
**ঢাকা-১২১৯**

# অপরাজিতা

## শাহিদা শাহিন

লেখার কাজ শেষ করে যখন টেবিল থেকে উঠছি তখনই ফোনটা তার অস্তিত্ব জানান দিল। রিসিভারটা তুলে হ্যালো বলতেই ওপাশ থেকে রিনরিনে এক কণ্ঠ বলে উঠল- আমি।

- আমি নিশ্চয়ই কারো পরিচয় নয়!

- নিজের পরিচয়ের দাবি নিশ্চয়ই আমি শব্দের মাঝে নেই। তাছাড়া আজ সকালে যখন আপনার সঙ্গে দেখা হল, তখন কিন্তু নাম জানবার মতো কোনো সৌজন্যতা দেখাননি।

ঝট করে মনে পড়ে গেল আজ সকালের কথা। অফিসে পৌঁছাতেই দেরি হয়ে গেল। ইদানীং রাস্তায় বের হলেই জ্যামের কবলে পড়তে হয়। অফিসে পৌঁছে নির্দিষ্ট চেয়ারে বসেই দেখি ফাইলের একটা স্তূপ জমা হয়ে আছে আমার জন্য। বেল টিপে কফির কথা বলে ফাইলগুলোর মাঝে ডুবে গেলাম। অখন্ড মনোযোগে যখন ফাইলগুলো নিয়ে ব্যস্ত, তখন আমাদের পিয়ন রশীদ এসে জানাল গেস্ট এসেছে। হাতের কাজটা শেষ করে গেস্টরুমে যেতেই দেখি আমার কাছে আসা গেস্টের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে আনিস ভাই। অফিসে যারই গেস্ট আসুক, তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়া আনিস ভাইয়ের এক অভ্যাস। সবার দেখভাল করার মহান দায়িত্ব যেন তার কাঁধে।

একটু এগিয়ে দেখি সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি মেয়ে বসে আছে। সুন্দর মুখশ্রীর দিকে তাকালেই যে জিনিসটি চোখে পড়বে তা হল উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ আর কপালের কালো টিপ।

আমাকে দেখেই আনিস ভাই বলল- এই যে সুমন্ত, কী করছিলে? তোমার জন্য কখন থেকে বসে আছে। কী বলে কথা শুরু করব ভাবছি, এমন সময় রশীদ এসে জানাল বসের রুমে জরুরি তলব।

- একটু আসছি বলে ছুটলাম বসের রুমে।

ফিরে এসে দেখি আনিস ভাই বসে আছেন যথাস্থানে, অন্য স্থানটি শূন্য। আনিস ভাইয়ের দিকে তাকাতেই কৌতুকমাখা চোখে একটু মৃদু হাসলেন, যেন সব জেনে বসে আছেন। অথচ মেয়েটি কে তাও আমার জানা হল না। আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, কপাল বটে তোমার। তা আজকাল কাব্যচর্চা কী একটু বেশি হচ্ছে, যা থেকে এমন সুন্দরী ভক্ত জুটে গেল? তাও আবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে কাঠখড় পুড়িয়ে ঠিকানা নিয়ে একেবারে অফিসে হাজির।

- কিন্তু দেখা তো হল না।

- হল না বলছ কেন? দেখা হল, কথা হল না। তোমার কাজের ব্যস্ততা দেখে চলে গেল, অন্যদিন আসবে।

ঘটনাটা মনে পড়তেই কিছুটা আড়ষ্ট হয়ে বললাম-

- আমি সত্যই দুঃখিত। আজ কিছুটা ব্যস্ত ছিলাম। বসের রুম থেকে এসে দেখি আপনি নেই।

- আনিস ভাই বলছিল আপনার ব্যস্ততার কথা।

এভাবেই প্রথম আলাপ অথচ এবার ও তার নাম জানতে চাইনি, ফোন নম্বর নেয়া হয়নি। নামটা না জানায় মনটা কেমন কচকচ করতে লাগল।

প্রাইভেট একটা ব্যাংকে চকরির পাশাপাশি কবিতা লেখার একটা ঝোঁক আছে। মাঝেমধ্যে সেগুলো বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপাও হয়। কবিতা বা আমার ভক্ত জোটা এই প্রথম না হলেও এমন সুন্দরী নারী ভক্ত এই প্রথম তা মানতে হবে।

পরদিন একই সময় ফোনটা বেজে উঠল। মনে মনে আমিও এর অপেক্ষায় ছিলাম। ছোঁ মেরে রিসিভারটা তুলে নিতেই ওপাশ থেকে সেই রিনরিনে গলায় তার আস্তিত্ব জানান দিল।

- কী আশ্চর্য দেখুন, আপনার সঙ্গে কথা হয় অথচ এখনো আপনার নাম জানি না।

- অপরাজিতা।

- আমার দেয়া নামটার কাছাকাছি।

- ঠিক বুঝতে পারলাম না।

- বুঝিয়ে দিচ্ছি। আপনার নাম যেহেতু জানা ছিল না, তাই আমি আপনার নাম দিয়েছি অপরিচিতা।

- বাঃ! দু'দিন আপনার সঙ্গে কথা হল তবুও আমি অপরিচিতা।

এমনি করেই অপরাজিতার সঙ্গে কথার পিঠে কথা চলত দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। আমাদের কথা হত মহাদেব সাহার কবিতার মতো- কখন একটি ফুলের ছোট নাম, একটি পাখির শিস, টুকিটাকি হয়ত হারিয়ে গেছে বা চুপচাপ কোনো দুপুরবেলার গল্প।

প্রথমে অবচেতন মনে হলেও পরে সচেতনভাবেই আমি ওর ফোনের অপেক্ষা করতাম। অপরাজিতা ওর ফোন নম্বর দেয়নি। আমিও জোরাজুরি করিনি। কেননা, ও নিয়মিত ফোন করে, কথা হয়, আমাকে প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎসাহ দেয় আবার আমার কাজের সমালোচনাও করে।

দুজনের কথা হয় নিয়মিত, এ ক্ষেত্রে আমি শ্রোতার ভূমিকা নিতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। কেননা, অপরাজিতা কথা বলে খুব সুন্দর করে; ওর কথা শুনতে শুনতেই মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। ভালোবাসতে শুরু করি। বুঝতে পারি অন্যপক্ষের অবস্থাও এক। কিন্তু ভালোবাসার কথা একে অন্যকে বলি না কেউই।

মনে মনে কথা সাজাই ওকে বলবার জন্য, ওকে জানাবার জন্য। আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে আমি ওকে ভালোবাসি। আমার প্রতিটি ক্ষেত্রে ওর সাহচর্য পাবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি।

যখন ওর সাহচার্য পাবার জন্য ছটফট করছি, তখনি হঠাৎ করে ফোন আসা বন্ধ হয়ে গেল। যোগাযোগের কোনো মাধ্যম নেই। হায়! কেন যে ওর ফোন নম্বর রাখিনি। এই আক্ষেপে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে।

প্রতিদিন প্রতীক্ষা করি কিন্তু সেই কাঙ্ক্ষিত ফোন আর আসে না। নতুন উদ্যমে দিন শুরু হয়ে আমাকে হতাশায় ডুবিয়ে শেষ হয়ে যায়। মাস কেটে যায়, আমার প্রতীক্ষা যেন শেষ হয় না।

অবশেষে এল সেই কাঙ্ক্ষিত ফোন-

রিনরিনে সেই পরিচিত গলায় কথা বলল অনেকক্ষণ। কিন্তু কেন এতদিন ফোন করেনি তার কিছুই না বলে জিজ্ঞেস করল- এসব কী লিখেছ?

-ফিরে এসো
ফিরে এসো নীল অবারিত প্রান্তর ছুঁয়ে
ধূলিমাখা পায়
আমি তোমার প্রতীক্ষায়

- কে ফিরে আসবে? কার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে বসে আছ?

- কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম, তুমি জান আমি কার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি? আমার সমগ্র সত্তা বিলীন করে কেন তুমি দূরে সরে আছ?

নিশ্চুপ অপরাজিতা। বুঝতে পারছি দু'চোখ বেয়ে নেমে যাচ্ছে কান্নার ধারা। কিছুই বলল না, ফোনটা রেখে দিল।

বুঝতে পারছি না অপরাজিতা কেন এমন করছে।

অফিসে এসে দেখি গেস্টরুমে কে যেন বসে আছে। সেই একই রকম বসার ভঙ্গি। বুকটা ধক করে উঠল। এগিয়ে যেতেই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি শমিতা। সুদৃশ্য একটা প্যাকেট আমাকে দিয়ে জানাল, অপরাজিতা দিয়েছে।

- দেখুন সুমন্ত, অপরাজিতা আমার বোন। আপনাদের দু'জনের মধ্যে সুন্দর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারত, যদি না কিছুদিন আগে অ্যাকসিডেন্টে অপু দৃষ্টিশক্তি হারত। আমি দেখেছি ওকে ভালোবেসে যন্ত্রণা পেতে। হয়ত আপনিও একই রকম যন্ত্রণা পাচ্ছেন।

শমিতা চলে যাবার পর প্যাকেটটা খুলে দেখি অনেকগুলো অপরাজিতা ফুল। নীল ফুলগুলোর মাঝে একটা চিরকূট। অপরাজিতা লিখেছে-

ভালোবাসলেই কাছে আসতে হবে কেন? আমি না হয় দূরে যাবার জন্যই তোমাকে ভালোবাসলাম।


**বি-১২৩/ সি-১০**
**এজিবি কলোনি, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০**